রাজা ও প্রজা।

মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ের নিমিত্ত।
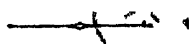
শ্রীগঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল

প্রণীত।

কলিকাতা।

S. K. LAHIRI & Co., CALCUTTA.

BOOKSELLERS AND PUBLISHERS.

54, College Street.

১৩০৭।

ভূমিকা।

দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস দেব বলিয়াছিলেন, মাখন ভোরেই ভাল উঠে, ভক্তিও সেইরূপ বাল্যে অধিক স্ফূর্ত্তি পায়, বয়স অধিক হইলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়, শুষ্ক হৃদয়ে সহজে ভক্তির উদ্রেক হয় না। দেব-ভক্তির ন্যায় রাজভক্তিও বালকের কোমল হৃদয়ে যেমন সহজে সঞ্চারিত হইবে প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের অপেক্ষাকৃত কঠিন হৃদয়ে সেরূপ হইবে না। "রাজা ও প্রজা" বালকদিগেকে তাই রাজভক্তি শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

কোন একটা দেশের ইতিহাস ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে তাহার শাসন-প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য। উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর স্কুলের ছাত্রেরা ইংরাজী ও বাঙ্গালায় ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করেন, কিন্তু এই মহাদেশের অতীত ও বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় না বলিয়া এ দেশের ইতিহাসপাঠে আশানুরূপ ফল-লাভ হয় না। আর, যাহারা মহম্মদ তোগলক কি নাগপুরের আপ্পা সাহেবের কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছেন তাঁহারা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কিংবা বিভাগীয় কমিশনরকে কি কি কাজ করিতে হয় তাহা সবিশেষ জানেন না, ইহা বাস্তবিকই বড় লজ্জার কথা। "রাজা ও প্রজা" ছাত্রদিগের লজ্জা-নিবারণ এবং ইতিহাস-পাঠের সার্থকতা-সম্পাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে।

উন্নত গভর্ণমেণ্টমাত্রেই প্রজাকে কতকগুলি অধিকার দিয়া থাকেন, ইংরাজ গভর্মেণ্ট ভারতীয় প্রজাকেও কতকগুলি অধিকার দিয়াছেন। "রাজা ও প্রজা" সেই অধিকার ও তদনুরূপ কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিবার চেষ্টাও করিয়াছে।

"রাজা ও প্রজা"র এই ত্রিবিধ চেষ্টা সফল হইলে এবং তদ্দ্বারা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কিঞ্চিন্মাত্র উপকৃত হইলে সকল শ্রম সার্থক হইবে।

কলিকাতা। শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মা।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

স্কুল সমূহের অধ্যক্ষ মহোদয়গণের উৎসাহে "রাজা ও প্রজা" দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইল। ছিদ্রান্বেষণের পথ সঙ্কুচিত করিবার অভিপ্রায়ে স্থানে স্থানে ভাষার পরিবর্ত্তন করা হইল। শিক্ষা-সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষগণের কৌতূহল-শান্তির জন্য বলা আবশ্যক, আমি Hunter's Imperial Gazetteer of India, Bengal Administration Reports, Thacker Spink & Co's Directory প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ হইতেই অধিকাংশ বিষয় সংগ্রহ করিয়াছি; আর লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকাল হইতে যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং ভূতপূর্ব্ব নববিভাকর সংবাদ-পত্র সম্পাদন কালে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি তাহার স্মৃতিও "রাজা ও প্রজা"র প্রণয়নে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

কলিকাতা।
৮ই মাঘ, ১৩০৭।

শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

রাজা ও প্রজা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজা ও প্রজা।

শৌর্য্যবীর্য্য পরাক্রমেই হউক, আর উত্তরাধিকার-সূত্রেই হউক, এক এক দেশে এক একজন ব্যক্তি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, দেশের অবশিষ্ট লোক তাঁহার শাসনাধীন হইয়া রহিয়াছে। ইহারা প্রজা, ইহারা যাঁহার শাসনাধীন তিনি ইহাদের রাজা। "প্রজা" শব্দের একটী অর্থ সন্তান, কারণ রাজা ও প্রজার মধ্যে পিতাপুত্র-সম্বন্ধ। সন্তান যেমন বিপন্ন হইলে পিতার শরণাগত হয়, প্রজাও সেইরূপ ত্রাসিত হইলে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। পুত্র যেরূপ পিতৃসেবাই আপনার পরমধর্ম্ম বলিয়া জানেন, প্রজাও সেইরূপ রাজসেবাই আপনার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন; আর পিতা যেরূপ সর্ব্বদা পুত্রের কল্যাণ কামনা করিয়া তাহাকে সর্ব্ববিষয়ে সুখস্বচ্ছন্দে রাখিতে অভিলাষী, রাজাও সেইরূপ প্রজার সর্ব্বাঙ্গীণ সুখস্বচ্ছন্দতা-বর্দ্ধনেই রাজদণ্ড-গ্রহণের সার্থকতা অনুভব করিয়া থাকেন।

উপরে যে রাজাপ্রজার সম্বন্ধের কথা কথিত হইল তাহা আদর্শ রাজা ও আদর্শ প্রজার বেলাই প্রত্যক্ষ করা যায়। ঈদৃশ রাজা প্রজা এখন কল্পনার চক্ষেই দেখিতে হয়। ত্রেতাযুগের রামরাজ্য কালযুগে কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এখন লোকের পাপপ্রবৃত্তি প্রবল, স্বার্থ-

পরতাই হৃদয়-রাজ্যের প্রধান নিয়ন্তা, অবিহিত স্বাধীনতাস্পৃহা ভক্তি-শ্রদ্ধার মূলোচ্ছেদক। তাই এখন ইউরোপের অনেক স্থানে দেখিতে পাই, রাজার প্রতি প্রজার ভক্তি নাই, প্রজার প্রতি রাজার স্নেহ নাই। সমাজের অবস্থা এইরূপ বিকৃত হইয়াছে বলিয়াই ছত্রদণ্ড চামর সিংহাসনেও রাজার শান্তি নাই, প্রজারও কোন অবস্থায় পরিতৃপ্তি নাই।

হিন্দুজাতি শাস্ত্রের অনুশাসনে, কুলক্রমাগত শিক্ষা ও সংস্কারবশে এবং স্বভাবসিদ্ধ ভক্তিনম্রতাগুণে চিরকালই রাজচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আসিয়াছে। রাজা দিব্যপুরুষ, দেবকুলে তাঁহার জন্ম, এ সংস্কার প্রাচীন গ্রীস্ দেশেও ছিল, ভারতবর্ষেও ছিল। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই কথা যাঁহাদের মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছিল তাঁহারা তত প্রাচীনকালের লোক নহেন, কারণ দিল্লীর মোগলসম্রাট্‌কে উদ্দেশ করিয়া এই কথাটী বলা হইয়াছে। তাই বলিতেছি, রাজভক্তি হিন্দুজাতির নূতন জিনিশ নহে, রাজানুরাগের জন্য তাঁহারা চিরকালই প্রসিদ্ধ। ভগবানের লীলায় সেই হিন্দুজাতি আজ খৃষ্টান রাজার অধীন; কিন্তু ইংরাজরাজ বিধর্ম্মী হইলেও হিন্দুর রাজভক্তি বিচলিত হয় নাই। যাহারা উপদ্রবী মুসলমান রাজার প্রতিও ভক্তি দেখাইয়াছিল তাহারা প্রজাবৎসল ইংরাজ গভর্মেণ্টের প্রতি ভক্তিমান্ না হইবে কেন? হিন্দুর শাসন জন্য রীতিমত পুলীশ পল্টনের তাদৃশ প্রয়োজন নাই, পিনালকোড ও দুর্গের সবিশেষ আবশ্যকতা নাই। ইহারা অতিশয় নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি, ইহাদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য মিষ্ট বাক্য ও স্নিগ্ধ ব্যবহারই যথেষ্ট। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সেই বাৎসল্য-স্নিগ্ধ ব্যবহারেই হিন্দুজাতি আজ নিরুদ্বেগে ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারত-শাসনের দুরূহতা।

আমাদের ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার আন্তরিক ইচ্ছা ভারতীয় প্রজাকে তিনি সর্ব্ববিষয়ে সুখ শান্তি দান করেন, কিন্তু বহুযোজন দূরস্থিত ইংল্যাণ্ডে বসিয়া সেই ইচ্ছার সম্যক্ চরিতার্থতা লাভ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্য সুশাসন করা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা অত্রত্য প্রজার হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। প্রথমতঃ রাজ-প্রতিনিধি দ্বারা এই দেশ শাসন করিতে হইতেছে। প্রতিনিধি এদেশে আসিলে পর যদি বহু পরিশ্রম স্বীকার করেন তাহা হইলেও শাসন-সংক্রান্ত সমুদয় বিষয় এবং প্রজার অবস্থা সম্যক পরিজ্ঞাত হইতেই তাঁহার দুই'তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহার পর অবশিষ্ট দুই তিন বৎসরে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বুদ্ধি অনুসারে সকল কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না, কারণ প্রচলিত নিয়মানুসারে তাঁহাকে পাঁচ বৎসরের পর ইংল্যাণ্ডে প্রতিগমন করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় প্রজাপুঞ্জ অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত, এক এক জাতির এক এক প্রকার ধর্ম্ম, সামাজিক পদ্ধতি ও সংস্কার। সুশাসন করিতে গেলে এ সমুদয় ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। কিন্তু তাহা কি সহজ ব্যাপার? আমরা এ দেশের অধিবাসী হইয়াও এ সকল বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহি, নবাগত গভর্ণর জেনারেলের পক্ষে অল্প সময়ে তাহা বুঝিয়া উঠা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ এদেশীয়দিগের ভাষা শিক্ষা করা রাজপুরুষদিগের কর্ত্তব্য, ভাষা না জানিলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রজার নিকট হইতে তাহার মনোগত ভাব সম্যক্ অবগত হইবার উপায় নাই। এই ভাষা শিক্ষা অতিশয় কঠিন। চতুর্থতঃ, এদেশীয়দিগের সহিত রাজপুরুষদিগের ধর্ম্ম ও আচার-গত পার্থক্য থাকায় ইঁহারা তাহাদের সহিত মিশিতে পারেন না, সুতরাং

তাহাদের সামাজিক অবস্থা, মনের ভাব, সংস্কার ও চিন্তাস্রোতের গতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে না। ইহাতে রাজ্যশাসনসম্বন্ধে বিস্তর অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। হিন্দুর দেবালয়ে যবনের প্রবেশ নিষিদ্ধ। নবাগত আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় তাহা জানেন না, তিনি জুতা না খুলিয়া দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন, ইহাতে মন্দিরের রক্ষকগণের এবং সাধারণ হিন্দু-সমাজের মনে আঘাত লাগিল, লোকে ভাবিল ইংরাজরাজ হিন্দুর ধর্ম্ম ও দেবতার অবমাননা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই ঘটনায় তাহারা গভর্মেণ্টের প্রতি বীতরাগ হইতে পারে। আবার মনে কর, সেই নবাগত ম্যাজিষ্ট্রেট কোন ভদ্র হিন্দু অথবা মুসলমান মহিলার নামে সপিনা দিলেন. সেই রমণী আদালতে উপস্থিত না হওয়াতে তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট অর্থাৎ গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির করিলেন। এই কার্য্যও নিতান্ত গর্হিত হইল, কারণ এদেশীয় ভদ্রমহিলার পরপুরুষের সমক্ষে উপস্থিত হওয়া দেশাচার-বিরুদ্ধ। এই প্রসঙ্গে আমাদের পঠদ্দশার একটী কথা মনে পড়িল। প্রেসিডেন্সি কলেজে বিবি সাহেব নামে একজন খ্যাতনামা গণিতাধ্যাপক আসিয়াছিলেন। ১৮৬৬ সালে ইনি দ্বিতীয় বার্ষিকী শ্রেণীতে পড়াইতেছেন এমন সময় একটী ছাত্র কি সামান্য অপরাধ করিয়াছিল, তাহাতে বিবি সাহেব সেই ছাত্রটীকে সোপানৎ পদাঘাত করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় ছাত্রবিদ্রোহ উপস্থিত হইল, মহামতি সট্‌ক্লিফ সাহেব তখন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, বিলাতের স্কুলকলেজে ঈদৃশ পদাঘাত দোষাবহ নহে, বিবি সাহেব মনে করিয়াছিলেন এখানেও সেইরূপ দূষণীয় নহে, ইনি নূতন লোক এখানকার পদ্ধতি অবগত নহেন। অধ্যক্ষ মহাশয় অতিশয় ছাত্রবৎসল ছিলেন, তাঁহার কথায় ছাত্রেরা শান্তভাব ধারণ করিল। অথচ দেখ, বিবি সাহেবের ন্যায় ভদ্র ও অমায়িক ইংরাজ সহস্রের মধ্যে একজন দেখা যায় কি না সন্দেহ।

এইরূপ ঘটনা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, ইংরাজরাজের সংকল্প ও অভিপ্রায় যার পর নাই সাধু হইলেও রাজপুরুষদিগের অনভিজ্ঞতা-দোষে গভর্মেণ্ট কখন কখন প্রজার অপ্রিয় হইতে পারেন। বিদেশীয় রাজপুরুষের দ্বারা ভারতশাসন কার্য্য সম্পাদন পক্ষে যে সকল অনিবার্য্য অবশ্যম্ভাবী অসুবিধা আছে তাহা যদি এদেশীয়গণ সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করেন তাহা হইলে প্রজাবিরাগ সঞ্চারের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী জনপদ।

ইংল্যাণ্ড একটী ক্ষুদ্র দেশ। বিস্তৃতির বিষয় ভাবিলে ভারতবর্ষের সহিত ইহার তুলনাই হয় না। সমগ্র ইউরোপ হইতে রুশিয়া বাদ দিলে তাহা ভারতবর্ষের সহিত সমান হইতে পারে। এক ছোট লাট বাহাদুরের শাসনাধীন বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরই ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েল্‌সের দেড় গুণেরও অনেক অধিক। লোকসংখ্যা সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বঙ্গীয় লেপ্‌-টেন্যাণ্ট গভর্ণরের অধীনে আনুমানিক ৬৯৫৩৬৮৬১ জন প্রজা বাস করিতেছে, কিন্তু এত লোক রুশিয়া ব্যতীত ইউরোপের অন্য কোন দেশে নাই। বিহারের লোকসংখ্যাও ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েল্‌সের লোকসংখ্যা অপেক্ষা বেশী কম নহে। ইংল্যাণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র দেশ শাসন করা সহজ, ভারতের ন্যায় বিশাল সাম্রাজ্যে সকল দিকে দৃষ্টি রাখা শাসনকর্ত্তার পক্ষে অতীব কঠিন ব্যাপার।

শাসনকর্ত্তারা প্রায়ই রাজধানী নগরে অবস্থান করেন। বড় লাট, ছোট লাট প্রভৃতি উর্দ্ধতন রাজপুরুষগণ কলিকাতা, এলাহাবাদ প্রভৃতি রাজধানী নগরে বাস করেন, কলেক্টর কমিশনর প্রভৃতি অধস্তন

রাজপুরুষেরা এক এক জেলার প্রধান নগরে অধিষ্ঠান করেন। এই সকল নগর হইতে বহুদূরে অবস্থিত গ্রাম ও ক্ষুদ্র নগর সমূহে দৃষ্টি রাখা শাসক অনুশাসকদিগের কর্ত্তব্য, এই জন্য তাঁহারা নিয়মিত সময়ে মফস্বলে ভ্রমণ করিয়া প্রজার অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া বেড়ান, কিন্তু তাঁহারা এতাদৃশ শ্রম স্বীকার করিলেও আশানুরূপ ফললাভ হয় না, হইতেও পারে না। ছোট লাট বাহাদুর মফস্বলে যাইয়া তদধীন রাজপুরুষদিগের নিকট হইতেই সংবাদ সংগ্রহ করেন, ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় মফস্বলে যাইয়া তাঁহার অধীনস্থ পুলীশ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করেন। দূরবর্ত্তী গ্রামবাসী প্রজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভাব ও কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করা তাঁহাদের প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। প্রজাও অধিকাংশ স্থলে নিরক্ষর ও ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ, রাজপুরুষেরা কোন্ সময়ে কোথায় পরিদর্শনে গমন করিবেন তাহার সংবাদ তাহারা রাখে না, রাখিলেও হুজুরের সম্মুখে হাজির হইতে তাহাদের হয় ত সাহস হয় না। তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেটকে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা বলিয়াই জানে, তিনি যে দণ্ডবিধানের জন্য আসেন নাই, প্রজার মঙ্গলবিধানের জন্যই আসিয়াছেন এ ধারণা তাহাদের হইবার কথা নয়, সুতরাং অস্ত্র-চিকিৎসিত বালক যেরূপ ডাক্তারকে দেখিয়াই পলায়ন করে, গ্রাম্য প্রজারাও সেইরূপ ম্যাজিষ্ট্রেটের আগমন-বার্ত্তায় ত্রাসে দূরে প্রস্থান করে; তাঁহার প্রস্থানবার্ত্তায় তাহাদের মলিন মুখ পুনরায় হাস্যসমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

প্রজার প্রকৃত অবস্থা ও অভাব অবগত হইবার জন্য মফস্বল পরিদর্শনের যে ব্যবস্থা আছে তাহা ব্যতীত সদাশয় গভর্মেণ্ট আর একটী উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা সংবাদপত্র-প্রচারে অনুমতি ও উৎসাহ দিয়াছেন, কেন না এদেশীয়দিগের সম্পাদিত সংবাদপত্র পাঠে রাজপুরুষেরা দূরবর্ত্তী স্থানের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। আজ কাল ভারতবর্ষের এক এক প্রদেশে বহুসংখ্যক

দেশীয় সংবাদপত্র চলিতেছে, গভর্মেণ্ট সংবাদপত্রস্থ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করাইবার জন্য উপযুক্ত লোক রাখিয়াছেন এবং অনুবাদ মুদ্রিত হইলে তাহার এক এক খণ্ড বিভাগীয় ও উপবিভাগীয় শাসক অনুশাসকদিগের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শাসন-সংক্রান্ত এই সকল কথার আলোচনা করিলে বুঝা যায়, ভারতীয় প্রজা যেরূপ সুখের অবস্থা কামনা করে তাহা যদি কোন কোন স্থলে না ঘটিয়া উঠে তাহা ইংরাজরাজের দোষ নহে। ইংরাজ-রাজ বিধিমতে প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু রাজ্যের বিশালতা ও অন্যান্য কারণে সে ব্যবস্থায় প্রজার দুরবস্থা সম্পূর্ণ ঘুচিতেছে না। বিলাত ক্ষুদ্র দেশ, প্রজারাও অধিকাংশ শিক্ষিত, সুতরাং তাহারা প্রধানতম কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া আপনাদের কষ্ট দূর করিতে পারে, ভারতবর্ষে তাদৃশ প্রতিকার সম্ভাবিত নহে। ইংরাজ গভর্মেণ্ট ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া কীদৃশ গুরুভার আপনার স্কন্ধে সমারোপিত করিয়াছেন এবং এই মহাদেশ শাসনের জন্য কিরূপ বিরাট আয়োজন করিয়াছেন তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গ্রাম।

ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে অন্যূন পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার গ্রাম ও নগর আছে, এই সকল গ্রাম ও নগর লইয়াই ভারত-সাম্রাজ্য। নগর অপেক্ষা গ্রামের সংখ্যা অনেক অধিক, নগরের সংখ্যা দুই তিন শতের অধিক হইবে না।

এক একটী গ্রাম অতিশয় ক্ষুদ্র, আবার এক একটী অতিশয় বৃহৎ। যে গ্রামে বহু ভদ্রলোকের বাস তাহাকে চলিত ভাষায় গণ্ডগ্রাম কহে,

এরূপ গণ্ডগ্রামের সংখ্যা বঙ্গদেশেই অধিক ; বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গ্রামগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্র। এমন কি, কুড়ি পঁচিশ ঘর গৃহস্থ লইয়াও অনেক গ্রাম হইয়াছে। এইরূপ গ্রামে কৃষকের সংখ্যাই অধিক। কৃষকেরা দস্যুভয়ে পরস্পর পরস্পরের নিকটে সামান্য বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহারা সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট, ক্ষুধাই ইহাদের অন্নের প্রধান উপকরণ, এদেশজাত স্থূল বস্ত্রই ইহাদের পরিধেয়, গ্রাম্য গুরুমহাশয়ই ইহাদের প্রধান অধ্যাপক, জমিদার অথবা গভর্মেণ্টের তহশিলদারই ইহাদের চক্ষে প্রধান রাজ-পুরুষ।

গণ্ডগ্রামের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত। এখানে যে সকল ভদ্র লোকের বাস তাঁহাদের চেষ্টায় রাস্তা ঘাটের অবস্থা ভাল হইয়াছে, সুপেয়-জলপূর্ণ পুষ্করিণী কূপ খনন করা হইয়াছে, হাট বাজারের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে, বালকদিগের শিক্ষার্থ উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ফলতঃ সভ্য সমাজের যাহা যাহা আবশ্যক তাহার অনেকটা আয়োজন করা হইয়াছে। গ্রামই নগরের শৈশবাবস্থা একথা গণ্ডগ্রামের অবস্থা দেখিলেই বুঝা যায়, কারণ গণ্ড-গ্রামগুলিই অনতিদীর্ঘকালমধ্যে নগরে পরিণত হইয়া থাকে। গণ্ডগ্রামবাসীর মধ্যে অনেকে রাজধানীস্থ স্কুল কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া আপনাদের অবস্থা উন্নত করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ গ্রামেরও নানা বিষয়ে উন্নতি করিয়াছেন। এইরূপ শিক্ষিত লোকের চেষ্টায় অনেক গণ্ডগ্রামে মিউনিসিপ্যাল শাসন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র গ্রামে রাজপুরুষদিগের পদার্পণ হয় না বলিলেই হয়। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে ডাকাইতি কি খুন হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট পুলীশ সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্ট প্রভৃতি রাজপুরুষ গমন করিয়া থাকেন ; অথবা যদি ভূমিখণ্ড-বিশেষের সীমা কি অন্য কোন প্রকার স্বত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে মুন্সিফ মহাশয় মকদ্দমার যাথার্থ্য নিরূপণের জন্য

আবশ্যক বিবেচনা করিলে স্বয়ং গ্রামে উপস্থিত হইয়া থাকেন। গ্রামবাসীদিগের সহিত খাস গভর্মেণ্টের সংস্রব এত কম, তথাপি মুষ্টিমেয় পুলীশ প্রহরী দ্বারা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা মহকুমার আসিষ্টাণ্ট কি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সদরে বসিয়া দূরবর্ত্তী মফস্বলের গ্রামসমূহকে বৃটিশ-শাসনশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রাচীনকালের গ্রাম ও এখনকার গ্রামে অনেক প্রভেদ। পূর্ব্ব-বর্ত্তী রাজাদিগের শাসনসময়ে রাজকর্ম্মচারীরা যদৃচ্ছাক্রমে প্রজার নিকট হইতে শস্য অথবা টাকা আদায় করিতেন, ইঁহারা প্রজাকে কি পরিমাণ শোষণ করিবেন প্রজা তাহা জানিতে পারিত না। এখন ইংরাজের আমলে নির্দ্দিষ্ট খাজনা ও নির্দ্দিষ্ট কর দিতে হইতেছে। যে যে প্রদেশে জমিদারকে খাজনা দিতে হয় সেখানে জমিদারের হিসাব-বহিতে এবং যেখানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে গভর্মেণ্টকে খাজনা দিবার রীতি আছে সেখানে সরকারী সেরেস্তায় প্রজার নির্দ্দিষ্ট খাজনা লিখিত আছে। এখন গ্রাম্য প্রজাকে যে চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে হয় তাহাও নির্দ্দিষ্ট হারে লওয়া হইয়া থাকে। প্রজা এখন বুঝিতে পারিতেছে, আমার এত আয়, খাজনা ও ট্যাক্স বাদে যাহা থাকিবে তাহা আমার নিজস্ব, ইহাতে আর কাহারও হাত পড়িবে না। প্রজার আয়ের পথও এখন প্রশস্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রজা নিজ পরিবারের প্রয়োজনানুরূপ ফসল উৎপাদন করিত, কারণ তদতিরিক্ত ফসল বিক্রীত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এখন সহর হইতে মহাজনেরা গ্রামে গ্রামে যাইয়া ধান, চাউল, পাট কলাই, তিশি, গম প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্যের দাদন দিতেছেন এবং যথাসময়ে সেই সকল সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া দেশান্তরে রপ্তানি করিতেছেন। শ্রমজীবীরা এখন স্থানান্তরে নির্ভয়ে গমন করিতেছে, সেখানে দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সঞ্চিত অর্থ লইয়া চাসবাসের সময় গৃহে প্রতিগমন করিতেছে। যাতায়াতের এখন বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। নগর হইতে গ্রামাভিমুখে প্রশস্ত রাজপথ

গিয়াছে, রাজপথের সহিত রেলওয়ে ষ্টেশনের সংযোগ হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন-সৌকর্য্যার্থ গভর্মেণ্ট স্থানে স্থানে খাল কাটাইয়া দিয়াছেন। খালের জল ক্ষেত্রে ব্যবহার করিবার জন্য কৃষকের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ কর আদায় করা হয় বটে, কিন্তু অনাবৃষ্টি ঘটিলে এবং খালের জল না পাইলে কৃষক এক মুষ্টি ধান্যও উৎপাদন করিতে পারিত না। সে যাহা হউক, প্রজা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিরুপদ্রব, দস্যুভয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম, সসৈন্য-শত্রুর আক্রমণভয় এখন একেবারেই নাই। ফলতঃ, এখন দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ গভর্মেণ্টের আশ্রয়চ্ছায়ায় অনেক বিষয়ে শান্তিসুখ উপভোগ করিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী।

গ্রামে বসিয়া থাকিলে ত ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী বুঝিতে পারিবে না। এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-চক্র কিরূপ চলিতেছে তাহা বুঝিতে গেলে প্রধান প্রধান নগরে যাইতে হইবে। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতায় শাসনচক্রের প্রধান নিয়ন্তা বড় লাট বাহাদুর অবস্থান করিতেছেন, বঙ্গীয় ছোট লাট সাহেব কলিকাতার দক্ষিণ উপনগর আলিপুরে অবস্থান করিতেছেন, উত্তর-পশ্চিমের ছোট লাট সাহেব এলাহাবাদে, বোম্বাইনগরে ঐ প্রদেশের গভর্ণর বাহাদুর, মাদ্রাজ নগরে মাদ্রাজ প্রদেশীয় গভর্ণর বাহাদুর, লাহোরে পঞ্জাবের ছোটলাট সাহেব, রেঙ্গুনে ব্রহ্মের ছোটলাট সাহেব অবস্থান করিতেছেন। সেক্রেটরি মহাশয়েরা শাসনকর্ত্তাদিগের দক্ষিণ হস্ত, ইঁহারাই লাট সাহেবদিগের উপদেশানুসারে শাসনসংক্রান্ত সকল কাজ করিতেছেন এবং মফস্বলের ম্যাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর, কমিশনরদিগকে

কাজ করাইতেছেন। রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া মফস্বলে যাও, হাবড়া, হুগলি, বর্দ্ধমান, ঢাকা বাঁকিপুর প্রভৃতি মফস্বলের রাজধানী নগর পরিদর্শন কর, তাহা হইলে বুঝিবে প্রকৃত শাসনকার্য্য কাহাদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে যাইয়া দেখ, জেলার বিচারকার্য্য কিরূপ চলিতেছে; কালেক্টরিতে যাইয়া দেখ, জমাজমি ও রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম কিরূপ সম্পাদিত হইতেছে; নগরের রাস্তাঘাট, মলনির্গম ও আলোকের ব্যবস্থা করিবার জন্য মিউনিসিপ্যাল সমিতির কিরূপ অধিবেশন হইতেছে, জেলার অন্যান্য স্থানের রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিবার জন্য কিরূপ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড মন্ত্রণা করিতেছেন, কারাদণ্ডিতদিগকে কিরূপ জেলের কঠোর শাসনে রাখিয়া খাটাইয়া লওয়া হইতেছে, সরকারী ডাক্তারখানায় সিভিল সাৰ্জ্জন মহাশয় বসন্ত-নিবারণী ইংরাজী টীকার ও নিরাশ্রয় রোগীর অবস্থান ও চিকিৎসার কিরূপ তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং পুলিশের কর্ত্তারা শান্তিরক্ষা ও দস্যুতস্করাদির উপদ্রব নিবারণের কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এই সমুদায় স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে।

কলিকাতা প্রভৃতি রাজধানী নগর এবং হুগলি বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি মফস্বলের নগর দেখিলে প্রতীয়মান হইবে ঐ সকল স্থানে দুই প্রকার শাসন-প্রণালী চলিতেছে। একটী খাস গভর্মেণ্টের শাসন-ব্যবস্থা, অপরটী স্বায়ত্ত-শাসন-ব্যবস্থা। প্রথমোক্ত ব্যবস্থা অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টর প্রভৃতি রাজপুরুষগণ ইংরাজ-রাজের প্রতিনিধিরূপে এক এক জেলার সকল কাজ করিতেছেন; দ্বিতীয় ব্যবস্থা অনুসারে প্রজারা আপনাদের প্রতিনিধি দ্বারা নগরবাস-ক্লেশ দূর করিতেছেন, অথবা জেলার জলকষ্ট ও পথকষ্ট নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রথমে এই স্বায়ত্তশাসনের কথাই বুঝাইয়া দেওয়া যাউক।

স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী।

এদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ইংরাজ গভর্মেণ্ট আপনার বেতনভোগী কর্ম্মচারীর দ্বারাই পয়ঃপ্রণালীর পরিষ্কার হইতে বিদ্রোহ-দমন পর্য্যন্ত সকল কাজ করাইয়া লইতেন। গভর্মেণ্ট তখন এদেশীয়-দিগের উপর সাধারণের মঙ্গলামঙ্গলসংক্রান্ত কোন কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। ক্রমে এদেশের লোকসংখ্যা বাড়িতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টরদিগের কাজও বাড়িয়া গেল। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনপদের অস্বাস্থ্য-করতা বৃদ্ধি হইল, উপার্জ্জনলোভে দূরদেশ হইতে শিষ্টপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টপ্রকৃতির লোকও নগরাভিমুখে আকৃষ্ট হইল, সুতরাং নগরের সঞ্চিত মল স্থানান্তরিত করিবার, জল নির্গমের পথ পরিষ্কৃত করিবার এবং পুলীশপ্রহরীর সুব্যবস্থা করিবার আবশ্যকতা অধিক হইয়া পড়িল। এই সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধানভার হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট-দিগকে কিয়ৎপরিমাণে অবসর দেওয়া কর্ত্তব্য এই বিবেচনায় গভর্মেণ্ট প্রধান প্রধান নগরে মিউনিসিপ্যালিটীর সৃষ্টি করিলেন। আমাদের এ অঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তাদিগের নাম রাখা হইল মিউনিসিপ্যাল কমিশনর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যালিটীর কাজকর্ম্ম "ভাইস চেয়ারম্যান্" অর্থাৎ সহকারী সভাপতি এবং "চেয়ারম্যান্" অর্থাৎ সভাপতি নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা প্রভৃতি নগরে বেতনভোগী চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান্ এবং সেক্রেটরি নিযুক্ত করা হইল। বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটীতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবই সভাপতি হইলেন। বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর প্রধান কর্ত্তার নাম মিউনিসিপ্যাল কমিশনর, ইনিও কলিকাতার চেয়ারম্যানের ন্যায় মাসিক ২৫০০।৩০০০ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। নগরের এক এক পল্লী হইতে এক এক জন কমিশনর নির্ব্বাচিত করা হইল, কারণ যে পল্লীর যে যে অভাব তাহা তত্রত্য কমিশনর মহাশয় মিউনিসিপ্যাল

সমিতিকে অবগত করাইয়া দূর করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। প্রত্যেক কমিশনর এইরূপ নিজ নিজ পল্লীর অস্বাস্থ্যকরতা ও পথকষ্ট দূরীকরণে যত্নবান্ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনেক শ্রমলাঘব হয়, সন্দেহ নাই।

এতদ্ব্যতীত গভর্মেণ্টের আর একটী উদ্দেশ্য আছে। ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিপণ সেই উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নির্ব্বাচন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মহামতি রিপণের ইচ্ছা ছিল, এদেশীয়গণ রাজনীতি-বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। ইংল্যাণ্ডের শাসন-প্রণালীর মূলে নির্ব্বাচন-প্রণালী রহিয়াছে। পার্লেমেণ্টের কমন্স সভায় যে ষট্‌শতাধিক সভ্য আছেন তাঁহাদের প্রত্যেককে এক এক পল্লীর প্রজা নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। নির্ব্বাচিত সভ্যেরা পার্লেমেণ্টে বসিয়া নির্ব্বাচক পল্লীসমূহের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করেন, অর্থাৎ তাহাদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আন্দোলন আলোচনা করিয়া থাকেন, অথচ সমগ্র ইংরাজ জাতির স্বার্থের কথাও বিস্মৃত হন না। লর্ড রিপণের ইচ্ছা ছিল এদেশীয় করদাতারাও আপনাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া মিউনিসিপ্যাল সভায় পাঠাইবেন, নির্ব্বাচিত কমিশনরগণ করদাতৃ-পল্লী ও সমগ্র মিউনিসিপ্যালিটীর মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন। আজকাল অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটীতে এই নির্ব্বাচন-প্রথা চলিতেছে। সভাপতি মনোনীত করিবার অধিকারও গভর্মেণ্ট কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটীকে দিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ অনেক স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর গভর্মেণ্টের মনোনীত কয়েক জন কমিশনরও নির্ব্বাচিত কমিশনরদিগের সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল সভায় আসন পাইয়া থাকেন। এই সতর্কতা অবলম্বনের তাৎপর্য্য এই, করদাতৃ-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ যদি বিজ্ঞ অথবা অভিজ্ঞ না হন তাহা হইলে গভর্মেণ্টের মনোনীত কমিশনরগণের অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞতায় মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না।

যে শাসনকার্য্যে প্রজার হাত আছে তাহাই প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন। সরকারী তহবিলে হাত থাকিলে অর্থাৎ আয়ব্যয়ে যদি কর্তৃত্ব থাকে তাহা হইলেই প্রজার প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন আছে এ কথা বলিতে পারা যায়। ইংল্যাণ্ডে পার্লেমেণ্টের অমতে নূতন ট্যাক্স বসাইবার যো নাই, নিয়মিত ব্যয় ব্যতিরিক্ত কোন ব্যয়ও করিবার বিধি নাই। এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ টাকা পার্লেমেণ্টের নিকট হইতে মঞ্জুর করিয়া লইতে হইয়াছে। পার্লেমেণ্টের ন্যায় মিউনিসিপ্যাল সমিতিরও আয়ব্যয়ে অনেকটা হাত আছে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনরগণই ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া থাকেন, করলব্ধ টাকা কোন্ কোন্ বিষয়ে কিরূপে ব্যয়িত হইবে তাহাও তাঁহারা স্থির করেন। কিন্তু প্রতিবৎসরের প্রারম্ভে আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিয়া গভর্মেণ্টের নিকট হইতে মঞ্জুর করাইয়া লইতে হয়, গভর্মেণ্টের হিসাব-বিভাগীয় কর্ম্মচারী আসিয়া সময়ে সময়ে মিউনিসিপ্যালিটীর হিসাবপত্র দেখিয়া থাকেন; এইজন্য আয়-ব্যয়ে কমিশনরদিগের "অনেকটা" হাত আছে এই কথা বলা হইয়াছে।

পাঠক স্মরণ রাখিবেন মিউনিসিপ্যালিটী কেবল নগর-বিশেষের পথ, ঘাট, জল, আলোক, পয়ঃপ্রণালী, মলনালী, আবর্জ্জন-পরিষ্কার ও শিক্ষা-সংক্রান্ত বন্দোবস্ত লইয়াই ব্যস্ত; ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ড নামে আর দুইটী আত্মশাসনা সমিতি আছে, তাহারা মিউনি-সিপ্যালিটীর বহির্ভূত জনপদসমূহের রাস্তা, পানীয় জল ও শিক্ষা প্রভৃতির যথাসাধ্য উন্নতিসাধনে যত্ন করিয়া থাকেন। লোক্যাল বোর্ড মহকুমার সমিতি, ইহার সভাপতি মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট; ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড জেলার সমিতি, ইহার সভাপতি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড জেলার "প্রাইমারি" শিক্ষার তত্ত্বাবধান করেন, কোন কোন জেলা স্কুলের তত্ত্বাবধান-ভারও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হস্তে দিয়া গভর্মেণ্ট সেই স্কুলের সহিত নিজের সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ

করিয়াছেন। কলিকাতার নাসাগ্রে যে হাবড়া গভর্মেণ্ট স্কুলটী ছিল তাহা এখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের স্কুল হইয়াছে। এই স্কুলের টাকা অকুলন হইলে হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটী ও হাবড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সেই টাকা দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সকল রাস্তার নির্ম্মাণ অথবা সংস্কার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড করেন না। মনে কর, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মেরামত করিতে হইবে। হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটার ভিতর দিয়া যত টুকু রাস্তা গিয়াছে তাহার মেরামত হাবড়ার মিউনিসিপ্যাল কমিশনরগণ করিবেন, এই মিউনিসিপ্যালিটার বহিঃস্থিত যে অংশটুকু যে যে জেলার ভিতর দিয়া গিয়াছে সেই সেই জেলার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সেই সেই অংশের জীর্ণ-সংস্কার করিবেন। লোক্যাল বোর্ড ও পথনির্ম্মাণ এবং পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী খনন করিয়া থাকেন, কিন্তু এই সকল কাজের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের তহবিল হইতে টাকা চাহিয়া লইতে হয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধিকাংশ আয় "রোডশেষ" অর্থাৎ পথ-কর হইতে হইয়া থাকে; "পাউণ্ড" অর্থাৎ খোঁয়াড় এবং "ফেরি" অর্থাৎ পার-ঘাটের আয়ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হাতে আসিয়া থাকে। এই আয়ে বোর্ড জেলার সকল অভাব দূর করিতে পারেন না, প্রদেশীয় গভর্মেণ্ট সাহায্য না করিলে বোর্ড দারুণ জলকষ্টের সময় প্রয়োজনানুরূপ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও খননের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ নহেন।

নির্ব্বাচন-প্রণালী।

কার্য্য-সম্পাদনের সৌকর্য্যার্থ প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটীকে কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই এক এক বিভাগের নাম "ওয়ার্ড"। কমিশনর-নির্ব্বাচনকালে এক এক ওয়ার্ডের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন হয়। কত টাকা ট্যাক্স দিলে কমিশনর হইতে পারা যায় এবং কত টাকা ট্যাক্স দিলে "ভোট" দিতে পারা যায় গভর্মেণ্ট তাহার একটা নিয়ম

বাঁধিয়া দিয়াছেন। কলিকাতায় ট্যাক্সের পরিমাণ অনুসারে কেহ বা একটী, কেহ বা দুইটী, কেহ বা ততোধিক ভোটে অধিকারী। "ভোট" শব্দের অর্থ মতপ্রকাশ। "আমি অমুক ব্যক্তির জন্য ভোট দিব" একথা বলিলে বুঝা যাইবে অমুক ব্যক্তি কমিশনর হন ইহা আমার মত। এইরূপ মত সংগ্রহ করার নাম ভোট-সংগ্রহ করা। সে যাহা হউক, কোন্ ওয়ার্ডে কয় জন কমিশনর চাই এবং এক এক ওয়ার্ডে কোন্ কোন্ করদাতা প্রদত্ত ট্যাক্সের পরিমাণ অনুসারে ভোট দিতে অধিকারী তাহার একটী তালিকা মিউনিসিপ্যাল আপিষ হইতে প্রস্তুত হয় এবং যে ওয়ার্ডে যাঁহারা কমিশনরপদপ্রার্থী তাহাও সাধারণের অবগতির জন্য প্রচারিত হয়। ইহার পর, নির্ব্বাচনের দিন স্থির করা হয়, কোন্ বাড়ীতে কোন্ ওয়ার্ডের নির্ব্বাচন হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করা হয়, ভোটাধিকারী করদাতারা নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে উপস্থিত হন, কর্তৃপক্ষীয় এক এক ব্যক্তি এক এক নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রের কর্ত্তা হইয়া ভোট লিপিবদ্ধ করেন, কমিশনরপদপ্রার্থীদিগের মধ্যে যাঁহার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট লিপিবদ্ধ হয় তিনিই কমিশনর নির্ব্বাচিত হইলেন এইরূপ অবধারিত হয়। এই নির্ব্বাচন-প্রণালীর যুক্তি এই, যাঁহাকে অধিকাংশ লোকে কমিশনর করিতে চাহেন তাঁহাকে করদাতৃমণ্ডলের প্রতিনিধি বলিয়া ধরা উচিত, আর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি মহাশয়েরা মিউনিসিপ্যালিটীর আয়ব্যয় সম্বন্ধে যাহা স্থির করিবেন তাহা করদাতারাই স্থির করিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রকৃত প্রতিনিধি কিন্তু খুঁজিয়া পাওয়া বড়ই দুষ্কর, কারণ দেখিতে পাওয়া যায় কমিশনরি-লাভার্থীরা অনেক সময়ে ছলে বলে কৌশলে যে কোন উপায়ে ভোট সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

নির্ব্বাচন-প্রণালীর প্রসর গভর্মেণ্ট ক্রমশই বাড়াইয়া দিতেছেন। আজকাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কয়েক জন সভ্য নির্ব্বাচন-প্রণালী অনুসারে মনোনীত হইতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একজন সভ্য

মনোনীত করেন, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী একজন, বণিক-সভা একজন, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশন নামক জমিদার-সভা একজন এবং পর্য্যায়ক্রমে এক এক ডিভিশনের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সমূহ এক একবার একজন করিয়া সভ্য মনোনীত করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইবার অধিকার পাইয়াছেন।

স্বায়ত্ত শাসনে গভর্মেণ্টের হস্তক্ষেপ।

ভারতশাসনের সমুদয় দায়িত্ব ইংরাজ গভর্মেণ্টের স্কন্ধেই রহিয়াছে, সুতরাং স্বাস্থ্যাদি কয়েকটী বিষয়ের ভার প্রজার হস্তে দিয়া গভর্মেণ্ট একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই, স্থলবিশেষে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা নিজহস্তে রাখিয়াছেন। আমাদের এই কলিকাতা মিউ-নিসিপ্যালিটীর একটী ঘটনার উল্লেখ করিলেই এ কথা বুঝিতে পারিবে। বিগত-পূর্ব্ব বৎসর কলিকাতায় প্লেগের আবির্ভাব হইল। এখানকার মিউনিসিপ্যালিটী প্লেগসংক্রমণ নিবারণের যে ব্যবস্থা করি-লেন তাহা ইউরোপীয় অধিবাসিগণ এবং গভর্মেণ্ট পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করিলেন না। এই বৃহৎ নগরের ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া গভ-র্মেণ্ট স্বহস্তে প্লেগ নিবারণের ভার লইলেন। প্লেগের ন্যায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে গভর্মেণ্ট সর্ব্বত্র এইরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। আবার দেখ, মিউনিসিপ্যাল আইনে কমিশনরদিগকে ট্যাক্স বসাইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কমিশনরগণ যদি মিউনিসিপ্যালিটীর ভিতর লবণের উপর ট্যাক্স বসান তাহা হইলে গভর্মেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন, ঐ ট্যাক্স বসাইতে দিবেন না, কারণ লবণের উপর গভর্মেণ্ট ট্যাক্স লইয়া থাকেন. একই সামগ্রীর উপর দুই বার ট্যাক্স লওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত প্রজাশাসনের ব্যবস্থা।

ইংরাজ গভর্মেণ্ট আমাদিগকে যে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দিয়াছেন তাহা কেবল রাস্তাঘাট জল ড্রেন সম্বন্ধে। প্রকৃত প্রজাশাসন-বিষয়ে জনকতক অবৈতনিক দেশীয় ভদ্রলোকের হস্তে ক্ষমতা দেওয়া কর্ত্তৃপক্ষেরা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না। তাই মিউনিসিপ্যাল নগরের পুলীশ কর্ম্মচারীদিগকে আপনাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়াছেন, কমিশনরদিগকে ইহাদের উপর কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব করিতে না। পুলীশ যে সকল রাজপুরুষের আদেশাধীন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজাশাসন করিতেছেন। এই প্রজাশাসনের সুবিধার জন্য ভারতসাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্র বৃহৎ কয়েকটী অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। বৃহত্তম অংশের নাম প্রদেশ, ক্ষুদ্রতম অংশের নাম মহকুমা।

মহকুমা, জেলা ও ডিভিশন।

যে জেলা অথবা মহকুমায় যাহার বাস তাহার নাম সেই লোকের অজ্ঞাত থাকে না। একজন সামান্য কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলে সে অমনি বলিবে, আমার অমুক জেলায় কি অমুক মহকুমায় বাস। কিন্তু জেলা অথবা মহকুমা কাহাকে বলে তাহা হয় ত সে ভাল করিয়া বুঝে না। সেই জন্য এই পরিচ্ছেদে তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য গভর্মেণ্ট কতকগুলি গ্রাম ও নগর লইয়া এক একটী মহকুমা অথবা সব ডিভিশন করিয়াছেন; এইরূপ আবার কয়েকটী মহকুমা লইয়া এক একটী জেলা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে এইরূপ ৪৫টী জেলা আছে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে অন্যূন ২৪৪টী জেলা ও সহস্রাধিক মহকুমা আছে। পাঁচ সাতটী জেলা লইয়া এক একটী ডিভিশন করা হইয়াছে। সকল ডিভিশনে সমান জেলা, অথবা

সকল জেলায় সমান মহকুমা নাই। এই দেখ, বর্দ্ধমান ডিভিশনে বর্দ্ধমান, হুগলি, বীরভূম বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাবড়া এই ছয়টী জেলা আছে, কিন্তু ঢাকা ডিভিশনে ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিসাল, ফরিদপুর এই চারিটী জেলা আছে। সবডিভিশনকে বাঙ্গালায় "মহকুমা", মাদ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে "তালুক" এবং উত্তর ভারতবর্ষে "তহশিল" বলে।

রাজপুরুষগণ।

মহকুমার প্রধান রাজপুরুষ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা অল্প বেতন-ভোগী আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। অধিকাংশ স্থলেই এদেশীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে মহকুমার শাসনভার ন্যস্ত হইয়া থাকে, তবে যে মহকুমায় সাহেব অধিবাসী অধিক অথবা যেখানকার প্রজারা দুর্দ্দান্ত সেখানে সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটই মহকমার প্রধান কর্ত্তা। হুগলি জেলার মহকুমা শ্রীরামপুরে অনেক সাহেবের বাস, এই জন্য এখানে সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট এবং দুমকার মহকুমা দেওঘর অথবা জামতাড়ায় দুর্দ্দান্ত সাঁওতালদিগের বাস অধিক ছিল বলিয়া এই দুই স্থানে সাহেব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হাকিমি করিয়া আসিতেছেন। মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের দক্ষিণ হস্ত পুলীশ ইনস্পেক্টর, তাঁহার বামহস্ত সরকারী চিকিৎসালয়ের দেশীয় ডাক্তার। ইনস্পেক্টরের সাহায্যে তিনি দুষ্টের দমন এবং ডাক্তার বাবুর সাহায্যে তিনি দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা, পুলীশের প্রেরিত মৃত দেহের পরীক্ষা এবং আহত ব্যক্তির আঘাত পরীক্ষা করিয়া থাকেন। মহকুমার কর্ত্তা ফৌজদারী আদালতের প্রধান বিচারপতি এবং তত্রত্য "ট্রেজারি" অর্থাৎ সরকারী তহবিলের প্রধান রক্ষক। দেওয়ানী মকদ্দমার বিচার মুন্সিফ মহাশয়ের নিকট হইয়া থাকে। মহকুমার কর্ত্তাকে কখন কখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভিতর থাকিয়াও কার্য্য করিতে হয়। বোম্বাই অঞ্চলে মহকুমার কর্ত্তাকে "মামলাতদার" কহে।

জেলার প্রধান রাজপুরুষ ডিষ্ট্রিক্ট জজ, কিন্তু ইনি বিচারকার্য্যেই ব্যাপৃত থাকেন, প্রকৃত শাসনকার্য্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটই করিয়া থাকেন। পুলীশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইঁহার দক্ষিণ হস্ত এবং সিভিল সার্জ্জন অথবা জেলার সাহেব ডাক্তার ইঁহার বাম হস্ত। জেলার ভিতর কোন স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইলে অথবা হত্যা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় পুলীশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সহিত ঘটনাস্থলে যাইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, এবং যদি কোন স্থান কারণ-বিশেষে অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে, যদি বসন্ত, বিসূচিকা ও প্লেগের ন্যায় মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয় তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সিভিল সার্জ্জনের সহিত পরামর্শ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করেন। ইনিই কলেক্টর-রূপে জমিদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করেন, অহিফেন, মদ প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের মাশুল আদায় করেন, আবার বিচারাসনে বসিয়া ফৌজদারী ও কলেক্টরি আইন অনুসারে বিচার করিয়া থাকেন। ইনি বন্দুক তরবারির পাশ দিয়া থাকেন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল কমিটির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং জেলার যাবতীয় মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য পরিদর্শন করেন। রাস্তা, ঘাট, খাল, পুল যেখানে যেখানে আবশ্যক ইনি ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা তাহা করাইয়া লন, বিবিধ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন, নিজ জেলার জেলের তত্ত্বাবধান করেন, ফলতঃ গভমেণ্টের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া জেলার যাবতীয় শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে যে দুইশত এক চল্লিশটী জেলা আছে তাহার শীর্ষস্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণই * ইংরাজ গভমেণ্টের স্তম্ভস্বরূপ, ইঁহাদের

* "নন্ রেগুলেশন" ডিষ্ট্রিক্টে ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের অনুরূপ রাজপুরুষের নাম ডেপুটী কমিশনর। যে সকল স্থানের অধিবাসীরা অত্যন্ত অসভ্য বা দুর্দ্দান্ত বলিয়া রাজপুরুষদিগকে আইন অনুসারে চলিতে বলা হয় না, আপনারা যেরূপ ভাল বুঝেন সেইরূপ ভাবে প্রজাশাসন করিবেন এই কথা বলিয়া দেওয়া হয় তাহাকে "নন্ রেগুলেশন"

রিপোর্টের উপর নিভর করিয়াই গভর্মেণ্ট এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য শাসন করিতেছেন।

পাঠক যেন এরূপ মনে না করেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং প্রদেশীয় লাট সাহেব এই দুই জনের মধ্যবর্ত্তী কোন শাসনকর্ত্তা নাই। উপরে যে ডিভিশনের কথা বলা হইয়াছে সেই ডিভিশনের কর্ত্তা কমিশনরগণ ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের এবং তৎসহচর অন্যান্য রাজপুরুষদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। কমিশনরই জেলার ম্যাজিষ্ট্রট, কল্লেক্টর, পুলীশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল সার্জ্জন প্রভৃতির উপরওয়ালা কর্ত্তা. ইহাদের প্রেরিত রিপোর্ট ও প্রয়োজনীয় পত্রাদির সারাংশ সংকলন করিয়া কমিশনর সাহেবই গভর্মেণ্টে পাঠাইয়া থাকেন।

বঙ্গীয় লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণরের অধীনে প্রেসিডেন্সি. বর্দ্ধমান, রাজসাহী, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম এই পাঁচটী ডিভিশন বঙ্গদেশে. পাটনা ও ভাগলপুর এই ডিভিশন দুইটা বিহারে এবং উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর, সর্ব্বশুদ্ধ এই নয়টী ডিভিশনে নয় জন কমিশনর নিযুক্ত আছেন।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যায় (১) মিরাট (২) আগ্রা (৩) রোহিলখণ্ড (৪) এলাহাবাদ (৫) বারাণসী (৬) গোরক্ষপুর (৭) কুমাউন (৮) লক্ষ্ণৌ এবং (৯) ফায়জাবাদ এই নয়টী বিভাগে নয় জন কমিশনর আছেন। পঞ্জাবে (১) দিল্লী (২) জলন্ধর (৩) লাহোর (৪) রাবলপিণ্ডি (৫) দেরাজাত (৬) পেশবার এই ছয়টী ডিভিশনে ছয় জন কমিশনর আছেন। বোম্বাইয়ে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ এই তিন ডিভিশনে তিন জন কমিশনর আছেন। মাদ্রাজে কমিশনরি ডিভিশন নাই।

ডিষ্ট্রিক্ট কহে। ইদানীং "নন্ রেগুলেশন" ডিষ্ট্রিক্টে গভমেণ্টের আইনকানুন অধিকাংশই প্রচলিত হইয়াছে, অথচ পূর্ব্বের সেই ডেপুটি কমিশনর নাম বদলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টর নাম হয় নাই। মধ্য-প্রদেশ, আসাম প্রভৃতি "নন্ রেগুলেশন প্রদেশের" উদাহরণ। সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম প্রভৃতি "নন্ রেগুলেশন ডিষ্ট্রিক্টের" উদাহরণ।

যাঁহাদের হস্তে ঈদৃশ অসীম ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে তাঁহাদের নিয়োগ-সম্বন্ধে সবিশেষ সাবধানতা আবশ্যক এ কথা গভর্মেণ্ট বিলক্ষণ বুঝেন। তাই বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট পদে লোক নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, সিভিলিয়ানগণ এদেশে আসিলে প্রবীণ ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে রাখিয়া তাঁহাদিগকে কাজকর্ম্ম শিখাইয়া থাকেন, এবং আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে এইরূপ শিক্ষানবিশি করিয়া পারদর্শিতা লাভ করিলে পর তাঁহাদিগকে জেলার কর্তৃত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তথাপি ব্যক্তিগত প্রকৃতি দোষে পাছে প্রজার প্রতি অত্যাচার হয় এই আশঙ্কায় গভর্মেণ্ট প্রবীণ সিভিলিয়ানদিগকে ডিষ্ট্রিক্ট জজের পদে উন্নীত করিয়া দেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে বিচার-বিভ্রাট ঘটিলে আপিলে ইনি সুবিচার করিয়া প্রজাকে শান্তিদান করেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত আপিল করিবার বিধান আছে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, প্রজাকে অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গভর্মেণ্ট কতদূর যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে শাসন-শক্তি ও বিচার-শক্তি এই উভয় শক্তি থাকাতে তিনি কোন কোন মকদ্দমায় ফরিয়াদী হইয়া আবার বিচারপতিরূপে সেই মকদ্দমার বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে সময়ে সময়ে সুবিচারের ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা,শাসন-শক্তি ও বিচার শক্তি পৃথক্ পৃথক রাজপুরুষের হস্তে থাকিলে সে সম্ভাবনা থাকে না, এ কথাও গভর্মেণ্ট বুঝেন, কিন্তু রাজকোষের অবস্থা অনুন্নত বলিয়া কর্তৃপক্ষ পৃথক্ ব্যবস্থার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না।

বৃটিশ গভর্মেণ্টের ভারতশাসন-নীতির উৎকর্ষ-পরিচায়ক আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। এই যে সহস্রাধিক সিভিলিয়ান রাজপুরুষ ভারতবর্ষের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা হইয়া অসীম ক্ষমতা পরিচালন করিতেছেন তাঁহাদের কেহই ত রাজবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন না। যাঁহারা বড়লাট ছোটলাট

হইয়া ভারত-সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানে বিরাজ করিয়া নিজ নিজ কাউন্সিলের সাহায্যে বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছেন তাঁহারাও যদৃচ্ছাক্রমে প্রজাশাসন করিতে পারেন না. তাঁহাদিগকেও আইনের নিকট নতশির হইয়া চলিতে হয়। যথেচ্ছাচারী সম্রাট্গণের পদ্ধতি অন্য প্রকার। স্বেচ্ছাই তাঁহাদিগের আইন, তাঁহারা নিজের যখন যেরূপ খেয়াল হয় তখন সেইরূপ করিয়া থাকেন। ইংরাজ গভমেণ্ট কিন্তু আইন-সূত্রে সকল রাজপুরুষকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, সে সূত্র ছিন্ন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। এখানে যদি একদিনের জন্যও কাহাকে জেলে পাঠাইতে হয় তাহা হইলেও যথারীতি আইন অনুসারে বিচার না করিয়া কারারুদ্ধ করিবার যো নাই।

ইংরাজ গভমেণ্ট কিরূপ প্রণালীতে ভারত-সাম্রাজ্য শাসন করিতেছেন উপরে তাহার কতকটা আভাস দেওয়া হইল। পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন বৃটিশ ভারতবর্ষ মহারাণীর একটী বিস্তীর্ণ জমিদারির মত। জমিদার যেমন জমিদারির স্থানে স্থানে উপযুক্ত নায়েব গোমস্তা ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাখেন, গভমেণ্ট সেইরূপ সবডেপুটি, ডেপুটি ও পুরা ম্যাজিষ্ট্রেট রাখিয়াছেন; আর জমিদার যেমন সকলের উপর তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া থাকেন, বিলাতে গভমেণ্ট সেইরূপ গভর্ণর জেনারেল, গভর্ণর ও লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া এই বিশাল ভারত-জমিদারি চালাইতেছেন। জেলাই এই জমিদারির প্রধান কার্য্যালয়, কারণ জেলার সদর ষ্টেশনেই জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর কার্য্য করেন; এইখানেই জেলার আদর্শ-মিউনিসিপ্যালিটী রহিয়াছে, এইখানেই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধিবেশন হয়, এইখানেই সিভিল সার্জ্জনের অধিষ্ঠিত হাসপাতাল, এইখানেই জেলার গণ্য মান্য লোকের সমাগম ও সভাসমিতি। ফলতঃ জেলার সদর ষ্টেশনেই দেশের ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, সৎসাহস ও সদনুষ্ঠান দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

থানা ও পরগণা।

জেলা ও মহকুমা ব্যতীত আর দুইটী বিভাগ আছে; একটীর নাম থানা, আর একটীর নাম পরগণা। পুলীশের এলাকা ঠিক করিয়া দেওয়া আবশ্যক, অন্যথা কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে। হাবড়ায় ডাকাইতি কি খুন হইলে হাবড়া থানা হইতে পুলীশ আসিয়া তদন্ত করিবেন, কলিকাতার পুলীশ কি ডায়মণ্ড হারবার হইতে পুলীশ আসিয়া তাহার তদন্ত করিবেন না, আর সেই ডাকাইতি অথবা খুন সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন প্রকার দায়িত্বও নাই, সমুদয় দায়িত্ব হাবড়া পুলীশেরই স্কন্ধে। কোন্ স্থান কোন্ পুলীশের অধীন তাহা ঠিক করিবার জন্য গভমেণ্ট এক এক জেলাকে কয়েকটী থানায় বিভক্ত করিয়াছেন। চব্বিশ পরগণায় ৩৯টী থানা আছে, দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে চারিটী থানা, গড়ে প্রত্যেক জেলায় ১৩টী করিয়া থানা ধরা যাইতে পারে। সমুদয় বঙ্গদেশে ৬২২টী থানা আছে।

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য মোগল শাসনকর্ত্তারা কয়েকটী গ্রাম লইয়া এক একটী পরগণা করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা এদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া প্রথম প্রথম পরগণা ধরিয়াই রাজস্ব আদায় করিতেন, তাহার পর দেখিলেন, মুসলমানদিগের আমলের এক এক পরগণার যে চতুঃসীমা ছিল তাহা অনেক স্থলে এখন আর ঠিক করিয়া উঠা যায় না, সুতরাং পরগণা-বিভাগ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রদেশ।

জেলা ও ডিভিশন অপেক্ষা বৃহত্তর বিভাগ আছে, তাহার নাম প্রদেশ। ইংরাজগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরূপে এদেশে আসিয়া কিছুকাল পরে বণিক-বেশ ছাড়িয়া রাজ-বেশ ধরিলেন, অর্থাৎ আপনাদের বাণিজ্য ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ক্রমশঃ এক একটী প্রদেশ অধিকার করিতে লাগিলেন। এই অধিকৃত প্রদেশের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, পরিশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সমগ্র ভারতবর্ষের উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলিলেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি অথবা প্রদেশ সর্ব্বপ্রথম অধিকৃত হয়। ইহার পর একে একে বোম্বাই, বঙ্গ প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, ব্রহ্ম, এই কয়েকটী প্রধান প্রদেশ ইংরাজগণ হস্তগত করেন। ইহা ব্যতীত আজমীঢ়, বিরার, কুর্গ, বেলুচিস্থান এবং আন্দামান এই পাঁচটী ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে। অতএব দেখা যাইতেছে শাসন-সৌকর্য্যার্থে বৃটিশ-ভারতবর্ষকে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩টি প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়াছে।

রাজপুরুষগণ।

উপরি উক্ত ১৩টী প্রদেশের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে এক একজন গভর্ণর আছেন; বঙ্গপ্রদেশ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ এবং পঞ্জাবে একজন করিয়া লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর আছেন। মধ্যপ্রদেশ ও আসামে চীফ কমিশনর আছেন। ব্রহ্মেও প্রথম চীফ কমিশনর ছিলেন, তাহার পর লর্ড ডফারিণের শাসনকালে উত্তর ব্রহ্ম অধিকৃত হইলে ১৮৯৭ সাল হইতে সমগ্র ব্রহ্ম প্রদেশ একজন লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণরের শাসনাধীন হইয়াছে। আজমীঢ় ও মাড়ওয়ারা একজন কমিশনরের শাসনাধীন বটে, কিন্তু ইহার উপর গভর্ণর জেনারেলের রাজপুতনা-

স্থিত এজেণ্ট সাহেব চীফ কমিশনররূপে কর্ত্তৃত্ব করেন। নিজামের রাজধানী হায়দ্রাবাদে যে বৃটিশ রেসিডেণ্ট আছেন তিনিই চীফ কমিশনররূপে বিরারের শাসনকর্ত্তা, ইঁহার অধীনে একজন কমিশনর ও একজন জুডিশিয়েল কমিশনর আছেন। এইরূপ, মহীশূরে যিনি ইংরাজ গভর্মেণ্টের রেসিডেণ্ট আছেন তিনিই দক্ষিণ ভারতস্থিত কূর্গ প্রদেশের চীফ কমিশনর; এবং কোয়েটা নগরের যিনি প্রধান রাজনৈতিক কর্ম্মচারী তিনিই বৃটিশ বেলুচিস্থানের চীফ কমিশনররূপে শাসনকার্য্য সম্পাদন করেন। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ রেঙ্গুন হইতে ৪৫০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং "আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের চীফ কমিশনর ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট" এতন্নামধেয় রাজপুরুষ কর্ত্তৃক শাসিত। গভর্মেণ্ট ভারতীয় সমাজের কণ্টকস্বরূপ গুরুতর অপরাধীদিগকে এই স্থানে নির্ব্বাসিত করিয়া থাকেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রদেশীয় রাজপুরুষের শাসনপ্রণালী।

ইংল্যাণ্ডের শাসনবিধি অনুসারে গভর্ণর জেনারেলেরই ভারতের সর্ব্বত্র সর্ব্বময়ী শাসনশক্তি আছে বটে কিন্তু প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা কার্য্যতঃ নিজ নিজ প্রদেশ মধ্যে সকল বিষয়ে অনিয়ন্ত্রিত শাসনশক্তি পরিচালন করিয়া থাকেন, গভর্ণর জেনারেল প্রায়ই তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা সাধারণতঃ ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের গভর্ণর।

ইঁহারা বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসেন। ইঁহারা দুইটী কাউন্সিলের সাহায্য লইয়া কার্য্য করেন, একটীর নাম লেজিস্লেটিভ

কাউন্সিল অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভা, আর একটীর নাম একজিকিউটীভ কাউন্সিল অর্থাৎ কার্য্যসম্পাদক সভা। প্রথম সভায়, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আইন প্রণীত হয়, দ্বিতীয় সভার সভ্যদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া গভর্ণর বাহাদুর শাসনসংক্রান্ত জটিল বিষয়ের মীমাংসা করেন। ইহাদের আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া বিভাগীয় কমিশনরগণ এবং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টরগণ কার্য্য করেন। ইহারা যে আইন করেন তাহা ইহাদের শাসিত প্রদেশেই চলে, অন্য প্রদেশে চলে না; গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর যে আইন করেন তাহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বলবৎ হইয়া থাকে। অন্যান্য প্রদেশের ছোটলাটদিগের অপেক্ষা ইহাদের ক্ষমতা কিঞ্চিৎ অধিক।

লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর।

বঙ্গপ্রদেশ,' উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশে যে এক একজন লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর আছেন তাঁহাদিগকে এখানকার বড়লাট বাহাদুর সিভিলিয়ান সম্প্রদায় হইতে মনোনীত করেন, বিলাতের কর্ত্তারা ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন না। ইঁহাদের মধ্যে কেবল বঙ্গীয় ও উত্তরপশ্চিমের লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণরের ব্যবস্থাপক সভা আছে, অন্যান্য প্রদেশের জন্য যখন যে আইন আবশ্যক হয় বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভাতেই তাহা প্রণীত হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কতকগুলি সভ্য ছোটলাট স্বয়ং মনোনীত করেন, অবশিষ্ট সভ্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মফস্বলের মিউনিসিপ্যালিটী অথবা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড মনোনীত করেন। একজিকিউটিভ কাউন্সিল কোন লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণরেরই নাই। বঙ্গীয় ছোটলাটের অধীনে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর এই কয় প্রদেশ আছে। ইঁহার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া বিভাগীয় কমিশনর, জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর প্রভৃতি রাজপুরুষেরা কার্য্য করিতেছেন।

চীফ কমিশনর।

ইহার পদ লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণরের নীচেই। যাঁহারা চীফ কমিশনরি করিয়াছেন সেই সকল রাজপুরুষ পরে লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণরের পদে উন্নীত হইতে পারেন। ইডেন সাহেব বৃটিশ ব্রহ্মের চীফ কমিশনরি করিয়া পরে বাঙ্গালার লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর হইয়াছিলেন। চীফ কমিশনরগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গভর্মেণ্ট অর্থাৎ বড় লাটের অধীন। চীফ কমিশনরের শাসন কিরূপ তাহা আসাম প্রদেশের দৃষ্টান্ত লইলেই বুঝা যাইবে। এই প্রদেশ ১৮৭৪ সালে বঙ্গীয় লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণরের শাসন হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ হইয়া একজন চীফ কমিশনরের শাসনাধীন হইয়াছে। ইঁহার অধীনে আসাম উপত্যকার কমিশনর এবং মণিপুর-রাজাপ্রবাসী ইংরাজপক্ষীয় পলিটিকেল এজেণ্ট আছেন, আর ১১টী জেলায় ১১জন ডেপুটি কমিশনর আছেন। ইঁহারা রাজস্ব-সংগ্রহ, প্রজাশাসন এবং কোন কোন স্থলে বিচারপতির কার্য্য করেন, অর্থাৎ বঙ্গদেশে ম্যাজিষ্ট্রেট যে যে কাজ করেন ইঁহারাও সেই সেই কাজ করেন। এতদ্ব্যতীত শাসন-সংক্রান্ত বিবিধ বিভাগে বিবিধ কর্ম্মচারী আছেন, অর্থাৎ "কণ্ট্রোলার অব একাউণ্টস" (হিসাব পত্রের অধ্যক্ষ), "ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল," ডেপুটি সার্জ্জন জেনারেল (চিকিৎসা বিভাগের কর্ত্তা,) স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর, সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, পুলীশ ও জেলসমূহের অধ্যক্ষ প্রভৃতি এক এক বিভাগের এক এক জন অধ্যক্ষ আছেন।

প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের সেরেস্তা।

চীফ কমিশনর, লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর অথবা গভর্ণর সকলেরই এক এক বিভাগের এক একজন সেক্রেটরি আছেন, সেক্রেটরিদিগের আপিশ আছে। ইহা ব্যতীত ইঁহাদের একজন করিয়া "প্রাইভেট সেক্রেটরি" থাকেন, ইনি গভর্ণর কিম্বা লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণরের বাটীতে

থাকিয়া খাস মুন্সিরূপে তাঁহার চিঠিপত্রাদি লিখেন। সরকারী কাজ-কর্ম্ম-সংক্রান্ত চিঠিপত্রাদি বিভাগ-বিশেষের সেক্রেটরিরাই লিখিয়া থাকেন। জেলা কি মহকুমার বার্ষিক রিপোর্ট লিখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়েরা বিভাগীয় কমিশনরের নিকট, এবং কমিশনর সেক্রেটরি-দিগের নিকট পাঠাইয়া দেন, সেক্রেটরি মহাশয়েরা তাহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া লাট বা ছোট লাট বাহাদুরের গোচরার্থ পাঠাইয়া দেন। বৎসরান্তে প্রত্যেক প্রদেশের যে শাসন-সংক্রান্ত রিপোর্ট মুদ্রিত হয় সেক্রেটরিগণই তাহা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। প্রদেশীয় রাজধানীতেই সেক্রেটরিদিগের আপিশ। বঙ্গীয় ছোটলাটের সেক্রেটরিরা কলিকাতায়, উত্তর-পশ্চিমের এলাহাবাদে, এবং পঞ্জাবের সেক্রেটরিরা লাহোরে থাকিয়া কার্য্য করেন। আসাম চীফ কমিশনরের সেক্রেটরিরা সিলং নগরে এবং মধ্যপ্রদেশের নাগপুর নগরে অবস্থান করেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট।

গভর্ণর জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিল একযোগে কার্য্য করেন, তবে স্থলবিশেষে কাউন্সিলের মত না লইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেলকে ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট বলে। গভর্ণর জেনারেল পূর্ব্বে কোম্পানির কর্ম্মচারী ছিলেন, পরে ১৮৫৮ সালে মহারাণী স্বয়ং ভারতশাসনভার গ্রহণ করিলে ইনি "ভাইসরয়" অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি নামে অভিহিত হইলেন এবং স্বয়ং মহারাণীর নিকট হইতে নিয়োগ-পত্র পাইতে লাগিলেন। ইঁহার রাজধানী কলিকাতা, গ্রীষ্ম-নিবাস হিমালয়ে সিমলা শৈল, স্থিতিকাল পাঁচ বৎসর এবং বেতন বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা।

বড়লাট সাহেব ২৫ কোটি ভারতবাসীর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সমগ্র ভারতবর্ষের সুশাসন কুশাসনের জন্য ইনিই দায়ী। ইনিই প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের অনুশাসক ও উপদেশক, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দৈবদুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইলে ইনিই প্রজার প্রাণ-রক্ষাকর্ত্তা; রেল, পুল, খাল প্রভৃতি দেশ-হিতকর কার্য্যের ইনিই অনুষ্ঠাতা, এদেশীয় বাণিজ্য নষ্ট করিবার জন্য বিদেশীয় বণিকদিগের অধর্ম্ম্য চেষ্টার ইনিই প্রতিবিধাতা এবং বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে ভারতবর্ষকে নিরাপদ করিবার ইনিই উদ্যোগকর্ত্তা। ইঁহার শাসনশক্তি একপ্রকার অনিয়ন্ত্রিত বলিলেই হয়, গুরুতর বিষয়েই ইঁহাকে বিলাতী বড় কর্ত্তা ষ্টেট সেক্রেটরি মহোদয়ের মত লইয়া কার্য্য করিতে হয়।

কার্য্য-প্রণালী।

বোম্বাই ও মাদ্রাজী গভর্ণরদিগের যেমন দুইটী করিয়া কাউন্সিল আছে, বড়লাট সাহেবেরও সেইরূপ একজিকিউটিভ কাউন্সিল ও লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল আছে। রাজকার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের সাতটী বিভাগ আছে;—

১। সৈনিক বিভাগ (মিলিটারি ডিপার্টমেণ্ট)।
২। রাজস্ব ও ব্যবসায় বিভাগ (ফিনান্সিয়াল ডিপার্টমেণ্ট)।
৩। পূর্ত্ত বিভাগ (পবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট।)
৪। স্ব-রাষ্ট্র বিভাগ (হোম ডিপার্টমেণ্ট)।
৫। পর-রাষ্ট্র বিভাগ (ফরেণ ডিপার্টমেণ্ট)।
৬। ভূমি-রাজস্ব ও কৃষি (রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট)।
৭। ব্যবস্থা বিভাগ (লেজিস্লেটিভ ডিপার্টমেণ্ট)।

প্রথম ছয়টী বিভাগের ছয় জন কর্ত্তা অথবা সেক্রেটরি একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর, স্বয়ং বড়লাট এই সভার প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতি। সাধারণতঃ সপ্তাহে একবার করিয়া সভার অধিবেশন

হয়। এই একজিকিউটিভ কাউন্সিলে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা এবং রুশ, চীন, আফগান প্রভৃতি বিদেশীয় জাতি ও স্বদেশীয় রাজগণের সহিত সম্বন্ধঘটিত বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে বিধিব্যবস্থাদি প্রণীত এবং প্রদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন অনুমোদিত হইয়া থাকে। এখানে এই কথাটী বলিয়া রাখা আবশ্যক, প্রদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল আইন প্রস্তুত হয় তাহাতে সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল সম্মতি প্রদান না করিলে তদনুসারে কার্য্য হইতে পারে না। ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের অসম্মতির কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না, তবে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল নূতন রকমের মিউনিসিপ্যাল আইন করিয়াছিলেন, তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই; এইজন্য সার জর্জ্জ পদত্যাগ করিয়া বিলাত চলিয়া যান, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৮ জন সভ্য আছেন, তন্মধ্যে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য ৬ জন, অপর ১২ জন প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য রাজপুরুষ হইতে এবং দেশীয় ও ইউরোপীয় বে-সরকারী গণ্যমান্য ব্যক্তি হইতে গভর্ণর জেনারেল নির্ব্বাচিত করিয়া লন।

কোন্ বিভাগে কি কি কার্য্য হয়।

১। সৈনিক বিভাগ। ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে ৭৩ হাজার গোরা সৈনিক এবং এক লক্ষ ৩৩ হাজার দেশীয় সৈনিক আছে তাহারা আমাদের "কমাণ্ডার-ইন-চীফ" অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির অধীন বটে, কিন্তু মিলিটারি সেক্রেটরি মহাশয়কে ইহাদের সকল সংবাদ ও হিসাব গভর্ণর জেনারেলের গোচরার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়।

২। রাজস্ব ও ব্যবসায় বিভাগ। এই বিভাগের সেক্রেটরি কেবল যে আয় ব্যয়ের হিসাব রাখেন তাহা নহে; ইঁহাকে পোষ্ট আপিশ,

টেলিগ্রাফ, অহিফেন, আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের মাশুল, লবণশুল্ক, স্বর্ণ রৌপ্যাদি মুদ্রা ও নোট প্রচলন, টাকশাল এবং ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের সংবাদ রাখিতে হয়।

৩। পূর্ত্ত বিভাগ। সরকারী বাড়ী ঘর, রাস্তা, রেল, খাল, পুল এই সমুদায়ের সংবাদ সেক্রেটরিকে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়।

৪। স্ব-রাষ্ট্র বিভাগ। শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষা, আদালত, সরকারী পাদরি-সম্প্রদায়, পুলীশ, জেল, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি বিষয় এই বিভাগীয় সেক্রেটরির আলোচ্য ও দ্রষ্টব্য।

৫। পররাষ্ট্র বিভাগ। এই বিভাগের কর্ত্তার নাম "ফরেন সেক্রেটরি"। আফগানস্থান, তিব্বৎ, চীন প্রভৃতি সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশের রাজারা বৃটিশ ভারতের সীমা অতিক্রম করিলেন কি না, অথবা অন্য কোন রূপ অবৈধ আচরণ করিলেন কি না, অথবা ভারত গভমেণ্টের করদ ও মিত্র রাজগণ কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিলেন কি না তাহার সংবাদ ফরেন সেক্রেটরি রাখিয়া থাকেন। যাঁহার সহিত যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে, অথবা যে পত্রাদি লিখিত হয় তাহা ফরেন আপিসেই রাখা হয়। দেশীয় রাজগণের কার্য্যাকার্য্য-বিষয়ক সংবাদ সেক্রেটরি মহাশয় "পলিটিকেল রেসিডেণ্ট" নামক রাজপুরুষের নিকট হইতে এবং "গভর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট" নামক রাজপুরুষের নিকট হইতেও পাইয়া থাকেন। প্রধান প্রধান দেশীয় করদ রাজার নিকট এক এক জন "পলিটিকেল রেসিডেণ্ট" এবং নেপাল প্রভৃতি কয়েকটী স্বাধীন রাজ্যে এক জন করিয়া "রেসিডেণ্ট" আছেন।

৬। ভূমি-রাজস্ব ও কৃষি বিভাগ। ইহার ইংরাজী নাম "ডিপার্টমেণ্ট অব্ রেভিনিউ এণ্ড এগ্রিকল্‌চর্"। ভূমি-রাজস্ব, বৈজ্ঞানিক জরিপ, জমির বন্দোবস্ত, শাল সেগুন প্রভৃতির বন, ঝড় বৃষ্টির কাল ও পরিমাণ নিরূপণ, দুর্ভিক্ষ-প্রশমন প্রভৃতি বহু বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত এবং এই বিভাগীয় সেক্রেটরির আলোচ্য।

উপরে যে ছয়টী বিভাগের কথা বলা হইল তাহার অধ্যক্ষগণই গভর্ণর জেনারেলের চক্ষু ও কর্ণস্বরূপ। ইঁহাদিগের সাহায্যেই তিনি কলিকাতা অথবা সিমলায় বসিয়া এই বিশাল ভারত সাম্রাজ্য শাসন করিতেছেন। ভারত-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির কথা ভাবিতে গেলে কল্পনা-নয়নে ধাঁধা লাগিয়া যায়। ইংরাজ গভর্মেণ্টের এমন চমৎকার শৃঙ্খলা আছে বলিয়াই, কাজের এত আঁটাআঁটি বাঁধাবাঁধি আছে বলিয়াই এত বড় রাজ্যটা চলিতেছে, তাহা না হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান সাম্রাজ্যের যে দশা ঘটিয়াছিল বৃটিশ ভারত-সাম্রাজ্যেরও তাহাই ঘটিত।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রদেশীয় গভর্মেণ্টের সহিত ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের আর্থিক সম্বন্ধ।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা যে টাকা আদায় করিতেন তাহা সমস্তই ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের তহবিলে জমা হইত, তাহার পর যে প্রদেশের শাসন-কার্য্যের জন্য যত টাকার প্রয়োজন তাহা এক এক প্রদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। এই বন্দোবস্তে স্থানীয় গভর্মেণ্টের আয় বাড়াইতে প্রবৃত্তি হইত না, অকারণ-ব্যয় কমাইতেও চেষ্টা যত্ন হইত না। এই জন্য ১৮৭১ সালে আমাদের বড় লাট লর্ড মেও স্থির করিলেন, প্রদেশীয় গভর্মেণ্টের নিকট হইতে টাকা জমা করিয়া লইয়া পুনরায় তাঁহাদের নামে খরচ লেখায় অনেক অসুবিধা আছে, অতএব গভর্ণর, লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর প্রভৃতিকে আয়ব্যয়-বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণ স্বাধীনতা দেওয়া যাউক। ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট ইঁহাদের কাহার নিকট হইতে কত টাকা লইবেন তাহার চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত করা হইল না, কারণ তাহা হইলে স্থানীয় গভর্মেণ্টের আয়বৃদ্ধি হইলে ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের প্রাপ্য টাকার বৃদ্ধি হইবে না। এই জন্য লর্ড মেও বন্দোবস্ত করিলেন, পুলীশ, জেল, রেজিষ্ট্রেশন, শিক্ষা, চিকিৎসা, ছাপাখানা, রাস্তা, সরকারী ইমারত এই কয়টী বিষয়ের ব্যয়ভার প্রদেশীয় গভর্মেণ্টের স্কন্ধে দেওয়া হইবে এবং ব্যয়সংকুলনের জন্য ভারতীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয় ইঁহাদিগকে বৎসর ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বণ্টন করিয়া দিবেন। এই নূতন প্রণালী অনুসারে ৬ বৎসর কার্য্য চলিলে দেখা গেল, সকল প্রদেশেই উক্ত ৮টী বিষয়ে ভূয়সী উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পুলীশের অপেক্ষাকৃত ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে, অনেক নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্কুল পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, অথচ সকল বিষয়েই পূর্ব্বাপেক্ষা আয় অনেক বাড়িয়াছে।

১৮৭৭ সালে লর্ড লিটন আরও কয়েকটা বিষয়ের ব্যয়ভার স্থানীয় গভর্মেণ্টের হস্তে দিলেন এবং যে যে বিভাগের ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক, ব্যয়নির্ব্বাহের সুবিধার জন্য এরূপ কয়েকটী বিভাগও তাঁহা-দের হস্তে দিলেন। এই নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে বঙ্গীয় গভর্মেণ্টের হস্তে এই কয়েকটী বিষয়ের আয় আসিল;—(১) গাঁজা, মদ প্রভৃতি কয়েকটী মাদক দ্রব্যের আয়, (২) আমদানি রপ্তানি শুল্কজাত আয়ের কিয়দংশ, (৩) লবণ-শুল্কের কিয়দংশ, (৪) ষ্ট্যাম্প-বিক্রয়ের আয়, (৫) আইন আদালতের আয়, (৬) অন্যান্য কতিপয় বিষয়ের আয়। এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয় গভর্মেণ্টকে গড়ে বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা হইল। এই বন্দোবস্ত ৫ বৎসরের জন্য করা হইল। পঞ্চম বর্ষে অর্থাৎ ১৮৮১ সালে দেখা গেল, বঙ্গীয় গভর্মেণ্টের ৬৯ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই টাকায় ছোট লাট বাহাদুর বিবিধ বিষয়ে প্রজার উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৮২ সালে আবার নূতন বন্দোবস্ত হইল। এইরূপ পাঁচ

বৎসর অন্তর প্রদেশীয় গভর্মেণ্টের সহিত আজ কাল ভারত গভর্মেণ্টের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। ইংরাজীতে এই বন্দোবস্তকে "প্রভিন্সিয়াল কণ্ট্রাক্ট" বলা হইয়া থাকে। ১৮৮৭ সালের বন্দোবস্ত অনুসারে নিম্নলিখিত আয়গুলি প্রদেশীয় গভর্মেণ্টের হস্তে আসিয়াছে।

(১) ভূমি-রাজস্বের চতুর্থাংশ (২) ষ্ট্যাম্পের আয়ের ত্রি-চতুর্থাংশ (৩) আবগারির আয়ের চতুর্থাংশ (৪) রোড সেস প্রভৃতির সমগ্র আয় (৫) বন-বিভাগের আয়ের অদ্ধাংশ (৬) রেজিষ্ট্রেশনের আয়ের অদ্ধাংশ (৭) বঙ্গীয় ডাক বিভাগের সমগ্র আয় (৮) বঙ্গীয় টেলিগ্রাফের সমগ্র আয় (৯) আইন আদালতের সমগ্র আয় (১০) পূর্ত্ত-কার্য্যের আয়ের কিয়দংশ।

ব্যয়ের মধ্যে নিম্নের কয়েকটী ব্যয় প্রদেশীয় গভর্মেণ্ট বহন করিবেন এইরূপ চুক্তি হইয়াছে।—

(১) ষ্ট্যাম্প-সংক্রান্ত ব্যয়ের ত্রি-চতুর্থাংশ (২) আবগারির ব্যয়ের চতুর্থাংশ (৩) ভূমি-রাজস্ব-সংক্রান্ত সমুদয় ব্যয় (৪) আইন আদালত, পুলীশ, শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রভৃতি কয়েকটী বিভাগের সমুদয় ব্যয় (৫) রেজিষ্ট্রেশন প্রভৃতি কয়েকটী বিভাগের ব্যয়ের অর্দ্ধেক।

এই বন্দোবস্তে ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টেরও সুবিধা হইয়াছে, প্রদেশীয় গভর্মেণ্টেরও সুবিধা হইয়াছে। ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের কাজের ঝঞ্ঝট বিস্তর কমিয়া গিয়াছে। প্রদেশীয় গভর্মেণ্টের স্বাধীনতা বাড়িয়াছে, খরচ কমাইয়া আয় বাড়াইবার প্রবৃত্তি হইয়াছে এবং লোক-হিতকর কার্য্যে অর্থব্যয় করিবার অধিক সুবিধা হইয়াছে, কারণ এখন আর টাকার জন্য ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সেক্রেটরি অব্ ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া।

গভর্ণর জেনারেলের উপর বিলাতে যে কর্ত্তা আছেন তাঁহার নাম "সেক্রেটরি অব্ ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া"। ইনি মহারাণীর মন্ত্রিসমাজের অন্যতম সভ্য, মন্ত্রিসমাজের সঙ্গে সঙ্গে ইনিও পদত্যাগ করেন। গভর্ণর জেনারেলের ন্যায় ইঁহারও কাউন্সিল আছে। কাউন্সিলের সভ্যগণ সচরাচর দশ বৎসরের জন্য মনোনীত হন। ইঁহাদের অধিকাংশের মত লইয়াই ষ্টেট সেক্রেটরি কার্য্য করেন। ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের আয়ব্যয়ের হিসাব বৎসর বৎসর ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট পাঠাইতে হয়। ইনি আবার সেই হিসাব পার্লেমেণ্টে পেশ করেন। ষ্টেট সেক্রেটরির আপিশ হইতে আর একটা হিসাব প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে লোকের সাংসারিক অবস্থা ও শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে কিরূপ উন্নতি হইতেছে তাহার একটী বিবরণ প্রস্তুত হয়। সুতরাং ভারত-শাসনের আমূল বৃত্তান্ত ষ্টেট সেক্রেটরি মহোদয়ের হস্তে একপ্রকার সমালোচিত হইয়া থাকে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল আইন পাশ হয় তাহা গভর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে বিলাতে ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট পাঠান হয়; কোন আইন যদি মহারাণীর অনুমোদনীয় না হয় তাহা হইলে তিনি ষ্টেট সেক্রেটরি দ্বারা নিজ অনভিমতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। ষ্টেট সেক্রেটরি গভর্ণর জেনারেল হইতে অধস্তন সকল রাজপুরুষকেই আদেশ করিয়া পাঠাইতে পারেন, গভর্মেণ্টের যে কোন কর্ম্মচারীকেও পদচ্যুত করিতে পারেন। গভর্ণর জেনারেল, মাদ্রাজ বোম্বাইয়ের গভর্ণর, একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর অথবা হাইকোর্টের জজের পদ খালি হইলে কাহাকে শূন্যপদে প্রতিষ্ঠিত করা

হইবে তদ্বিষয়ে ষ্টেট সেক্রটরি মহারাণীকে পরামর্শ দিয়া থাকেন। ফলতঃ ভারতীয় ষ্টেট সেক্রেটরির হস্তে অসীম ক্ষমতা রহিয়াছে, এই ক্ষমতা পরিচালন সম্বন্ধে এবং ভারতবর্ষের সুশাসন জন্য তাঁহাকে বৃটিশ পার্লেমেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, বিলাতের গভর্মেণ্ট ভারতবর্ষ শাসনের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইতে পারে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গভর্মেণ্টের আয়ব্যয়।

গভর্মেণ্টের আয়ের কিছুই স্থিরতা নাই, ব্যয়েরও স্থিরতা নাই। দূরব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতে পারে, প্রজার নিকট হইতে টাকা আদায় না হইতে পারে, অথচ দুর্ভিক্ষ শান্তির নিমিত্ত গভর্মেণ্টের কোটি কোটি টাকা খরচ হইয়া যাইতে পারে, সুতরাং আয় কমিবে, ব্যয় বাড়িবে। আয়ব্যয়ের এই নৈমিত্তিক হ্রাসবৃদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিলে মোটামুটি ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের আজকাল একশত কোটি টাকা আয় ও ইহার কিছু কম টাকা ব্যয় ধরা যাইতে পারে। বৎসর বৎসর অতি অল্প টাকাই গভর্মেণ্টের তহবিলে উদ্বৃত্ত থাকে।

গভর্মেণ্টের যতগুলি আয়ের পথ আছে তাহার মধ্যে ভূমি-রাজস্বই প্রধান। জমিদার ও অন্যান্য ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে বৎসর ৩৫।৩৬ কোটি টাকা আদায় হইয়া থাকে। লবণ-কর হইতে ৭।৮ কোটি, অহিফেন হইতে ৬।৭ কোটি এবং রেলওয়ে হইতে প্রায় ২৪।২৫ কোটি টাকা আদায় হয়। পাঠকের স্মৃতিশক্তিনিগ্রহ ভয়ে অন্যান্য আয়ের কথা উল্লেখ করিব না, শুদ্ধ যে যে সূত্রে আয় হয় তাহারই নামোল্লেখ করিয়া বিরত হইব।

(১) ষ্টাম্প বিক্রয় (২) গাঁজা মদ প্রভৃতি হইতে আয় (৩) আমদানি রপ্তানি শুল্ক অথবা পোরমিট-কর (৪) প্রদেশীয় কর (৫) ইন্‌কম ট্যাক্স প্রভৃতি কর (৬) বন বিভাগের আয় (৭) দলিল রেজেষ্টরি হইতে আয় (৮) করদ দেশীয় রাজগণের নিকট হইতে কর আদায় (৯) ডাকঘর হইতে আয় (১০) টেলিগ্রাফ হইতে আয় (১১) টাকশাল হইতে আয় (১২) আইন আদালত হইতে আয় (১৩) পুলীশ বিভাগ, নৌ-বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ ও চিকিৎসা বিভাগ হইতে আয় (১৪) সুদ আদায় (১৫) রেলওয়ে হইতে আয় (১৬) জল-সেচনার্থ খাল ও নৌকা-গমনাগমনের খাল হইতে আয় (১৭) পূর্ত্তকার্য্য হইতে আয় (১৮) সৈনিক বিভাগ হইতে আয় (১৯) কাগজ কলম কালি প্রভৃতি এবং সরকারী ছাপাখানা হইতে আয় (২০) অন্যান্য কতিপয় বিষয় হইতে আয়।

উল্লিখিত যে যে বিষয় হইতে গভর্মেণ্টের আয় আছে সেই সেই বিষয়ে আবার ব্যয় আছে। ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ব্যয় আনুমানিক ৪।৫ কোটি টাকা পড়ে, অহিফেনের চাষে এবং কর্ম্মচারীদিগের বেতনে ৩।৪ কোটি টাকা খরচ পড়ে। এইরূপ অন্যান্য বিভাগেও খরচ আছে। কিন্তু এমন বিষয় আছে যাহাতে আয় নাই, অথচ ব্যয় আছে। রাজপুরুষদিগকে বেতন দিতে হয় তাহাতে বিস্তর টাকা ব্যয় পড়ে, ইঁহাদের পেন্সন প্রভৃতিতেও অনেক টাকা পড়ে। আফগানস্থানের আমীরকে বার্ষিক ১৪।১৫ লক্ষ টাকা দিতে হয়, ব্রহ্মরাজ থিবকে ইংরাজ বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে টাকা দিতে হয়, লক্ষ্ণৌয়ের নবাব, মুরশিদাবাদের নবাব, ও অন্যান্য নবাব গুবাকে বৃত্তি দিতে হয়। ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের ৯২ কোটি টাকা দেনা ত এক দিনে হয় নাই, ক্রমশঃ জমিয়া গিয়াছে, তাহার সুদ বৎসরে প্রায় ৫।৬ কোটি টাকা দিতে হয়। ইহা ব্যতীত ষ্টেট সেক্রেটরির আপিশের খরচের জন্য এবং এদেশের সরকারী খরচের জন্য কাগজ কলম প্রভৃতি

লিখনোপকরণ, ষ্ট্যাম্প, ডাকের টিকিট প্রভৃতি এবং সরকারী রেলের কল কারখানা প্রভৃতির জন্য বিলাতে বিস্তর টাকা পাঠাইতে হয়। বিলাতের খরচের জন্য যে ১৭।১৮ কোটি টাকা পাঠান হয় তাহার বাঁটা লাগে প্রায় ৩।৪ কোটি টাকা।* বাজে খরচে এত টাকা যায় বলিয়া গভর্মেণ্টের টাকার সচ্ছলতা নাই। ব্যয়সাধ্য অচিন্তিত-পূর্ব্ব কোন ঘটনা উপস্থিত হইলেই ঋণের উপর ঋণ করিতে হয়, অথচ গভর্মেণ্টের এত সম্ভ্রম যে ধার চাহিলেই শত শত লোকে ৩৲ টাকা ৩।॰ টাকা সুদেও গভর্মেণ্টকে টাকা ধার দিতে লালায়িত। গভর্মেণ্টের ঋণ-পত্রকে "গভর্মেণ্ট প্রমিসরি নোট" অথবা কোম্পানির কাগজ বলে।

ইংরাজের লাভ।

পাঠকের একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ইংরাজ গভর্মেণ্ট যে এ দেশ হইতে এত টাকা আদায় করেন তাহার একটী পয়সাও বিলাতী গভর্মেণ্টের তহবিলে জমা হয় না। তবে কি ইংরাজ গভর্মেণ্ট এদেশে ভূতের বেগার খাটিতেছেন? না, তাহা নহে। ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া ইংরাজ গভর্মেণ্ট লাভবান না হউন, ইংরাজ জাতি নানা বিষয়ে উপকৃত হইতেছেন। এক ত বহুল শিক্ষিত অশিক্ষিত ইংরাজ ভারতবর্ষে ভাল মন্দ চাকরি পাইতেছেন; তাহার পর বিলাতী শিল্পজাত বিস্তর সামগ্রীর কাটৃতি এদেশে হইতেছে। তাহাতে বিলাতের বণিকদল লাভবান হইতেছেন, শ্রমজীবীরাও কল-

* বিলাতে স্বর্ণ মুদ্রা, ভারতে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত। রৌপ্যের মূল্য কমিয়া গিয়াছে, তাহাতে আবার এদেশের টাকায় খাদ আছে। এই হেতু এখন আর বিলাতী পাউণ্ড বা সভারেন ১০ টাকায় পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে কিন্তু ১০ টাকাতেই পাওয়া যাইত। এখন আর ৫টী টাকা অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ টাকা দিলে একটী পাউণ্ড অথবা সভারেন পাওয়া যায়। বোধ কর, বিলাতে বসিয়া একজন ৫০০ টাকা পেন্সন পাইতেছেন, গভর্মেণ্ট এখান হইতে তাঁহার জন্য ৭৫০ টাকা পাঠাইবেন, কারণ সেই ব্যক্তিকে বিলাতে স্বর্ণ মুদ্রায় পেন্সন দিতে হইবে; সুতরাং বাঁটার দরুণ যে ২৫০ টাকা বেশি দিতে হইল তাহা এখানকার গভর্মেণ্টের লোকসান হইল। বড় লাট লর্ড কর্জ্জন এদেশে স্বর্ণ মুদ্রা চালাইতেছেন।

কারখানায় খাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে। অধিক কথায় কাজ নাই, আজ যদি বিলাতী কাপড়ের বিক্রয় এদেশে বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে কাল বিলাতে হাহাকার পড়িয়া যাইবে, শত শত শ্রমজীবী পরিবার নিরন্ন হইয়া দরিদ্রশালায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইবে। বাণিজ্যসূত্রেই ইংরাজের ভারতাধিকার, আর কিছুর জন্য না হউক কেবল সেই বাণিজ্যের সুবিধার জন্যও ইংরাজকে ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ ভারতসাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বিলাতে ভারতের ব্যয়ে যে সকল সৈনিক শিক্ষিত হইতেছে তাহারা দক্ষিণ আফ্রিকাতেই হউক আর দক্ষিণ ইউরোপেই হউক যেখানে প্রয়োজন উপস্থিত হইবে সেই খানেই যাইয়া যুদ্ধ করিতে পারে। আর ভারতবর্ষে যে ত্রিসপ্ততি-সহস্র ইংরাজ সৈনিক ও লক্ষাধিক দেশীয় সৈনিক আছে তাহারাও ভারতেশ্বরীর মানমর্য্যাদা রক্ষার জন্য ইঙ্গিতমাত্রে সমর-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতে পারে। ঈদৃশ ও অন্যাদৃশ পরোক্ষ লাভ ইংরাজের আছে বলিয়াই ইংরাজ রাজপুরুষগণ অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় এদেশীয় অসহ্য উত্তাপ সহ্য করিয়া, ম্যালেরিয়া জ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া আত্মীয় স্বজনের বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও এদেশে প্রবাস করিয়া শাসন-কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রজার নিকট হইতে কর আদায়।

প্রজার নিকট হইতে রাজার করগ্রহণের অধিকার চিরকালই আছে। রামরাজ্যেও প্রজাকে কর দিতে হইত। তবে সেকালের রাজারা কর আদায় করিয়া প্রজার কল্যাণ-বিধানের নিমিত্ত সেই টাকা ব্যয় করিতেন, এইজন্য করদাতা ক্ষুণ্ণ হইতেন না। রঘুবংশে

কালিদাস সূর্য্যের সহিত রাজার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। সূর্য্যদেব করজাল বিস্তার করিয়া ভূমি হইতে রসগ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় বারিবর্ষণ করিয়া সেই ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি বিধান করিয়া থাকেন। আদর্শ রাজার প্রকৃতিই এই প্রকার। ইংরাজরাজ সেই আদর্শ রাজা কি না পাঠক বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবস্থা পর্য্যালোচন করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট যে শতাধিক কোটি টাকা ভারতবর্ষ হইতে রাজস্ব গ্রহণ করেন তাহার এক কপর্দ্দকও মহারাণীর নিজ তহবিলে যায় না, সে টাকা সমস্তই ভারত-শাসনকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। গভর্মেণ্ট প্রজার শিক্ষার জন্য প্রধান প্রধান নগরে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিত্রবিদ্যা, এবং শিল্পশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; গতায়াত ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রাস্তা, রেল, পুল, খাল করিয়াছেন, শস্যক্ষেত্রে বারিসেচনের জন্য খাল কাটাইয়াছেন, স্বল্পব্যয়ে সংবাদাদি প্রেরণের জন্য ডাক টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য পুলীশের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, হিংস্রজন্তু-হননের পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, খনিজ দ্রব্য উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ বহুবিধ বিধিব্যবস্থা দ্বারা প্রজার কল্যাণ বিধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। এইরূপ বিবিধ কল্যাণকর বিষয়ের অনুধ্যান করিলে আমরা যে টাকা ট্যাক্স দিতেছি তাহার সার্থকতা সহজেই সকলের হৃদয়ে উপলব্ধ হইতে পারে।

ভূমি-কর।

ভূমি-কর অর্থাৎ জমির খাজনা ভারতের সর্ব্বত্র সমান নহে, সমান হইতেও পারে না, কারণ সকল ভূমি তুল্যরূপ শস্যশালিনী নহে। পূর্ব্বে আকবর সাহ প্রভৃতি মুসলমান সম্রাটের শাসন-সময়ে ফসলের একতৃতীয়াংশ রাজা লইতেন। ইংরাজেরা এদেশের শাসনকর্ত্তা

হইয়া বাদশাহী পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পরিশেষে দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া আপনার প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। দুর্ভিক্ষ-কমিশনরদিগের মতে সমগ্র ভারতবর্ষে গড়ে সমুদয় ফসলের ১০০ ভাগের ৫½ ভাগ মাত্র গভমেণ্ট লইয়া থাকেন।

বঙ্গ বিহারের সর্ব্বত্র ও উড়িষ্যার কতক অংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হইয়াছে। লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন, তোমাদিগকে বৎসর বৎসর এত টাকা গভমেণ্টকে রাজস্ব দিতে হইবে, ভূমির উৎপাদনা শক্তির বৃদ্ধি হইলেও আমরা বেশি দাবি করিব না, হ্রাস হইলেও আমরা কম রাজস্ব লইব না, এই বন্দোবস্ত চিরকালের জন্য থাকিল। বঙ্গীয় ছোটলাটের তহবিলে এখন এই ভূমিরাজস্ব হিসাবে বৎসর বৎসর তিন কোটি সাড়ে তিন কোটি টাকা আসিয়া থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধা এই, গভর্মেণ্ট নির্দ্দিষ্ট টাকার অধিক দাবি করিবেন না এই বিশ্বাসে জমিদারেরা ভূমির উৎকর্ষসাধনে উৎসাহিত হইয়াছেন; যে সকল জমি পতিত ছিল, যাহাতে কৃষিকার্য্য চলিত না, সেই সকল জমিতে এখন প্রচুর ফসল হইতেছে, তাহাতে প্রজারও লাভ হইতেছে, জমিদারেরও লাভ হইতেছে। এদেশের অতীত ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়, যে সকল প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গভমেণ্ট প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন সেই সকল স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম, প্রজার তত হাহাকার শুনা যায় না, অন্নাভাবে তত জীবক্ষয় হয় নাই। আক্ষেপের বিষয় এই, ভারতের সর্ব্বত্র এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত নাই।

আসাম অঞ্চলে সমুদয় কৃষ্টভূমি কতিপয় মৌজায় বিভক্ত করা হয়। মৌজার কর্ম্মচারীর নাম মৌজাদার। ইনি বৎসর বৎসর ফসলের পরিমাণ দেখিয়া গভর্মেণ্টের নির্দ্দিষ্ট হার অনুসারে খাজনা ঠিক করিয়া দেন।

মান্দ্রাজ অঞ্চলে "রায়তওয়ারি" বন্দোবস্ত প্রচলিত। এখানে

বঙ্গের ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল হইল কারণ এখানে জমিদারের সংখ্যা অধিক ছিল না। যে কয়েকজন জমিদার পাওয়া গিয়াছিল তাঁহাদের জমির পরিমাণ সমস্ত মান্দ্রাজ প্রদেশের আট ভাগের একভাগ মাত্র, অবশিষ্ট সকল ভাগেই সার টমাস মনরো সাহেবের প্রবর্ত্তিত রাইয়ত ওয়ারি বন্দোবস্ত করা হইল। রাইয়ত অর্থাৎ প্রজার সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে রাজস্বের বন্দোবস্ত হইত বলিয়া ইহার নাম রাইয়তওয়ারি বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্ত অনুসারে এক এক জেলার পতিত ও আবাদী সকল জমিরই জরিপ করা হয়, তাহার পর সম্ভাবিত ফসলের পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়; শেষে প্রতি ক্ষেত্রের কত খাজনা হইতে পারে তাহা অবধারিত হয়। এই সকল কার্য্যে গভর্মেন্টের অনেক ব্যয় পড়ে, কারণ যদিও খাজনার বন্দোবস্ত ত্রিশ বৎসরের জন্য হইয়া থাকে, কোন রাইয়ত নূতন জমি লইয়া চাষ করিল কি না, অথবা তাহার জমি হস্তান্তরিত হইল কি না ইহা ঠিক করিবার জন্য রেভেনিউ-সর্ভে বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে প্রতিবর্ষেই ব্যস্ত থাকিতে হয়।

বোম্বাই প্রদেশেও গভর্মেণ্ট প্রজার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে খাজনার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। এখানকার ও মান্দ্রাজের পদ্ধতির কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ আছে, তাহা তরুণবয়স্ক পাঠকের জানিবার আবশ্যকতা নাই। বোম্বাইয়ের বন্দোবস্তও ত্রিশ বৎসরের জন্য হইয়া থাকে। মাদ্রাজ বোম্বাইয়ে প্রজা গভর্মেণ্টকে খাজনা দিয়া থাকে, বঙ্গ বিহার উড়িষ্যায় প্রজা জমিদারকে খাজনা দিয়া থাকে।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাবে জমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারীই গভর্মেণ্টের খাজনার নিমিত্ত দায়ী, গভর্মেণ্ট আসল মালিকের নিকট হইতে খাজনা আদায় করেন, ইনি আবার কৃষকদিগের নিকট হইতে আপনার প্রাপ্য খাজনা আদায় করিয়া লন। এখানেও মাদ্রাজ বোম্বাইয়ের মত জমির জরিপ ও ফসলের পরিমাণ স্থির করা

হয়। সাধারণতঃ জমির মালিক কৃষকের নিকট হইতে যে খাজনা পান গভর্মেণ্ট তাহার অর্দ্ধেক মালিকের নিকট হইতে রাজস্ব বলিয়া লন। অযোধ্যার বন্দোবস্ত কতকটা বঙ্গের মত। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে লর্ড ড্যালহৌসী এই প্রদেশটাকে ইংরাজাধিকার ভুক্ত করেন; ঐ বিদ্রোহের পর যখন সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপিত হইল তখন গভর্মেণ্ট দেখিলেন এখানকার তালুকদারেরাই প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী ভূম্যধিকারী, সুতরাং ইঁহাদের সহিতই গভর্মেণ্ট রাজস্বের বন্দোবস্ত করিলেন, কিন্তু বঙ্গের ন্যায় চিরস্থায়ী নহে, ত্রিংশৎবর্ষব্যাপী।

অন্যান্য প্রদেশে গভর্মেণ্ট দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আবার, যে যে স্থানে বৃহৎ জমিদারী আছে সেখানে জমিদারের উপদ্রব হইতে কৃষক-প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য সময়ে সময়ে ব্যবস্থাপক সভা হইতে আইন করাইয়া লইয়াছেন। দক্ষিণাপথের প্রজারা অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া মহাজনের নিকট হইতে অনেক টাকা ধার করিয়া থাকে এবং অতিরিক্ত সুদের দায়ে তাহারা একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। ঈদৃশ ঋণগ্রস্ত প্রজা সপরিবারে যাহাতে নিরন্ন হইয়া না পড়ে ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট আইন করিয়া তাহার উপায় করিয়া দিয়াছেন।

লবণ-কর।

লবণ হইতে গভর্মেণ্ট প্রতি মণে আড়াই টাকা কর গ্রহণ করেন। এই কর মহাজনেরাই দিয়া থাকে বটে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যাহারা অন্নব্যঞ্জনে লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে তাহারা সকলেই এই কর দিতেছে বলিতে হইবে, কেন না মহাজনেরা লবণের দর চড়াইয়া ক্রেতার নিকট হইতে মাশুলের টাকা তুলিয়া লন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার দুই বৎসর পরেই এক প্রকার লবণ-কর-দাতা, কারণ সে অন্ন ব্যঞ্জন খাইতে শিখিতেছে। অতএব দুই বৎসর বয়স হইতে চিতাপ্রবেশকাল পর্য্যন্ত সকলকেই এই কর দিতে হইবে। লবণ-করের হাত এড়াইতে পারে এমন লোক নাই।

লবণ চতুর্ব্বিধ। (১) বিলাতী লবণ। ইহার অধিকাংশ ইংল্যাণ্ডের চেশায়র বিভাগস্থিত খনি হইতে উৎপন্ন এবং লিভারপুল হইতে এদেশে আমদানি হয়। (২) সাগরোপকূলবর্ত্তী স্বল্পতোয় পুষ্করিণী-জাত। লবণাম্বু রৌদ্রে শোষিত হইলে পুষ্করিণীর তলদেশে লবণ পড়িয়া থাকে। (৩) রাজপুতনার লবণ-হ্রদ হইতে সংগৃহীত। (৪) উত্তর পঞ্জাবের পার্ব্বতীয় লবণ। ইহা খনি হইতে কাটিয়া লওয়া হয়। ইহাকে সৈন্ধব লবণ বলে। অহিফেনের ন্যায় লবণ প্রস্তুত করিবার অধিকার কেবল গভর্মেণ্টেরই আছে। পশ্চিম ভারতে গুজরাটে এবং পূর্ব্ব ভারতের উড়িষ্যা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমুদয় উপকূলে লোকে লবণ প্রস্তুত করিয়া গভর্মেণ্টের গোলায় আনিয়া দেয় এবং মণকরা দেড় আনা হিসাবে পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই দেড় আনার উপর গভর্মেণ্টের নিমক মহলের লোকজনের বেতনাদি ধরিলে মণকরা আন্দাজ ৵১০ আনা পড়ে। এই হইল একমণ লবণের প্রকৃত দাম। মহাজনেরা ইহার উপর মণকরা ২৷৷০ টাকা মাশুল দিয়া নুন-গোলা হইতে লবণ লইয়া ব্যবসা করে, কাজেই তাহাদিগকে ২৷৷৵১০ টাকা, বা কিছু অধিক দরে এই লবণ ক্রয় করিতে হয়। বিলাতী লবণের পড়তা পড়ে ৩৷৷০ টাকার কিছু কম। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, লবণকর হইতে গভর্মেণ্টের ৭৷৮ কোটি টাকা আয় আছে।

মাদক কর।

গভর্মেণ্ট তামাক ব্যতীত যাবৎ মাদক দ্রব্যেরই উপর কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। এদেশে মদের ভাঁটি আছে, তাহাতে দেশী মদ প্রস্তুত হয়, কিন্তু গভর্মেণ্টের আবগারী বিভাগীয় কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধান ব্যতি-রেকে তাহা প্রস্তুত করিবার যো নাই। প্রস্তুত করিবার জন্য গভ-র্মেণ্টকে বিস্তর টাকা সেলামিও দিতে হয়। অহিফেন গাঁজা, চরসও গভর্মেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রস্তুত করিবার যো নাই। গাঁজার চাস রাজসাহী জেলাতেই অধিক হইয়া থাকে। একই গাছ ত্রি-মূর্ত্তিতে

আবির্ভূত হইয়া থাকে ; ফুলন্ত ও ফলন্ত শিষের নাম গাঁজা, পাতা ও ছোট ছোট ডাটায় সিদ্ধি এবং আটায় চরস হয়। গভর্মেণ্ট যে সে স্থানে গাঁজা কি মদের দোকান করিতে দেন না। উদ্দেশ্য, প্রজার মাদক-স্পৃহা মন্দীভূত করা। এই উদ্দেশ্যে দূরে দূরে দোকান খুলিতে দেওয়া হয় এবং এক প্রকার নিলাম করিয়া সর্ব্বোচ্চ-রাজস্বদানার্থীকে দোকান বিলি করিয়া দেওয়া হয়। যেখানে আবগারির কাটতি অধিক সেখানে এক একটা দোকান তিন চারি হাজার টাকা খাজনাতেও বিলি হইয়া থাকে।

গভর্মেণ্টের অহিফেনের চাষ আছে। অধিকাংশ চাষ পাটনা ও বারাণসীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে এবং মধ্যভারতবর্ষের যে উচ্চভূমি পূর্ব্বে মালব নামে অভিহিত হইত সেই প্রদেশে হইয়া থাকে। পাটনা ও বারাণসীর এলাকায় গভর্মেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে চাষ করিবার যো নাই। গভর্মেণ্ট কিছু কিছু টাকা দাদন দেন, কৃষকেরা সেই টাকা লইয়া বর্ষাকালে চষিয়া ও সার দিয়া জমি তৈয়ার করিয়া রাখে, তাহার পর নভেম্বর মাসের প্রথমে বীজ ছড়াইয়া দেয়। বারংবার জল সেচন না করিলে গাছ সতেজ হয় না। ইহার ফলকে সাধারণতঃ ঢেঁড়ি পোস্তা বলে। মার্চ্চ মাসে কৃষকেরা অপরাহ্নে ক্ষেত্রে যাইয়া ঐ ফলের গা একটু একটু চিরিয়া দেয়, পরদিন প্রাতে ক্ষতস্থানে যে আটা পড়ে তাহা চাঁচিয়া লয়। এই আটাই অপরিষ্কৃত অহিফেন। এপ্রিল মাসে কৃষকেরা সঞ্চিত অহিফেন পাটনা ও গাজিপুরস্থিত গভর্মেণ্টের কারখানায় লইয়া যায়, সেখান হইতে আপনাদের পাওনা টাকা চুকাইয়া লইয়া আইসে। লবণের ন্যায় অহিফেনে গভর্মেণ্টের একচেটিয়া আছে, গভর্মেণ্টের অজ্ঞাতে কেহ অহিফেন প্রস্তুত বা বিক্রয় করিলে রাজদ্বারে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হয়।

মালব প্রদেশে এ সকল কড়াকড়ি নাই, কারণ উহার অধিকাংশই মহারাজ সিন্ধিয়া ও হুলকারের শাসনাধীন। কিন্তু মালবীয় অহিফেন ইংরাজ রাজ্যের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলেই তাহার মাশুল আদায় করিয়া লওয়া হয়। রাজপুতনার সর্ব্বত্র এবং মধ্য প্রদেশের কোন কোন স্থানেও অহিফেনের চাষ হয়, কিন্তু সে অহিফেন বিদেশে রপ্তানি হয় না, স্থানীয় অধিবাসীরাই তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

এই মাদক দ্রব্য বিক্রয়ে গভমেণ্টের আশ্রিত প্রজার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সবিশেষ কলুষিত হয় না, কারণ কলিকাতা হইতে চীনদেশেই অধিকাংশ অহিফেন রপ্তানি হইয়া থাকে, এদেশীয় অপেক্ষাকৃত অল্প লোকেই অহিফেন সেবন করেন। অহিফেন হইতে গভর্মেণ্টের প্রায় ৮ কোটি টাকা আয় আছে, ইহার মধ্যে নিজ ভারতবর্ষ হইতে বিশ লক্ষ টাকাও উৎপন্ন হয় না।

পোরমিট-কর।

পোরমিট-কর অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক হইতে গভর্মেণ্টের আয় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার অধিক হইবে না। যে সকল দ্রব্য বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আইসে তাহার কতকগুলির উপর গভর্মেণ্ট কর আদায় করেন, ইহার নাম আমদানি-শুল্ক। আর যে সকল সামগ্রী এদেশ হইতে মহাজনেরা বিদেশে পাঠাইয়া থাকেন তাহারও কতক-গুলির উপর গভর্মেণ্ট কর আদায় করেন, ইহাকে রপ্তানি-শুল্ক বলে। আমদানি ও রপ্তানি-শুল্ক দ্বারা বাণিজ্যের কতকটা ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। বিলাত হইতে এদেশে যে কাপড় আমদানি হয় পূর্ব্বে তাহার উপর এদেশে মাশুল লওয়া হইত। এই মাশুল ত বিলাতী বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা ঘর থেকে দিতেন না, তাঁহারা কাপড়ের দর চড়াইয়া মাশুলের টাকা তুলিয়া লইতেন, সুতরাং বিলাতী কাপড় একটু মহার্ঘ হইত। এরূপ হওয়াতে উহার কাটতি কম হইত, দেশী কাপড়ের কাটতি একটু বেশি হইত। একদিকে এদেশীয় তন্তুবায়দিগের

সুবিধা হইত, অপর দিকে বিদেশীয় তন্তুবায়দিগের ক্ষতি হইত। অবাধ-বাণিজ্যের অনুরোধে এই জন্য গভর্মেণ্ট অধিকাংশ আমদানি রপ্তানি-শুল্ক উঠাইয়া দিয়া এই বৈষম্য দূর করিয়াছেন। বিদেশ হইতে যে নানাজাতীয় সুরা আমদানি হয় তাহার আমদানি-শুল্ক লওয়া হইতেছে. ইহা হইতে ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের ৭০।৭৫ লক্ষ টাকা আয় আছে। রপ্তানি শুল্কের মধ্যে কেবল এদেশ হইতে বিদেশে যে চাউল রপ্তানি হয় তাহার উপর মণকরা ৵৹ আনা রপ্তানি-শুল্ক লওয়া হয়, তাহাতে গভর্মেণ্টের প্রায় এক কোটি টাকা আয় হয়। বিদেশীয় চিনি ব্যতীত অন্যান্য আমদানি রপ্তানি দ্রব্যের উপর মাশুল নাই বলিলেই হয়।

প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ কর।

প্রজার অবস্থা অনুসারে যে ট্যাক্স আদায় করা যায় তাহা প্রত্যক্ষ কর। মিউনিসিপ্যালিটিতে যাহাদের বাস তাহাদিগকে হাউস-রেট অর্থাৎ গৃহ-কর, ওয়াটার-রেট অর্থাৎ কলের জলের ট্যাক্স, লাইটিং-রেট অর্থাৎ আলোক-কর, এইরূপ যে কয়েকটা ট্যাক্স দিতে হয় তাহা প্রত্যক্ষ কর, কারণ প্রত্যেক গৃহস্থের বাসভবনের মূল্য অথবা ভাড়া নিরূপণ করিয়া এই সকল কর নির্দ্ধারিত হয়। জমিদার ও প্রজা রোড সেস ও পবলিক ওয়ার্কস সেস নামে দুইটা কর দিয়া থাকেন। ভূমির খাজনার উপর জমিদারের নিকট হইতে টাকায় এক পয়সা এবং প্রজার নিকট হইতেও টাকায় এক পয়সা আদায় হয়। এই দুইটী করও প্রত্যক্ষ কর।* ইনকম ট্যাক্সও প্রত্যক্ষ কর; যাহার বার্ষিক আয় ৫০০৲ টাকার অধিক তাহাকে টাকায় পাঁচ পাই হিসাবে ইনকম ট্যাক্স দিতে হয়। লবণ-করের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এইটী পরোক্ষ বা

* এক এক জেলায় যত টাকা রোড সেস আদায় হয় তাহাতে ঐ জেলার রাস্তা মেরামত ও নূতন রাস্তা তৈয়ারি হয়। পবলিক ওয়ার্কস্ সেসের টাকা প্রদেশীয় গভর্মেণ্টের তহবিলে থাকে, সরকারী বাড়ী ঘর, রেলওয়ে ও খাল খাতে এই টাকা খরচ হয়।

অপ্রত্যক্ষ কর, কেন না যে লবণ ব্যবহার করে সে হাতে করিয়া এই ট্যাক্স দেয় না, অথচ তাহাকে প্রকারান্তরে এই কর দিতে হয়, কারণ লবণের মহাজনেরা নিমক মহলে যে মাশুল দিয়া থাকেন তাহা তাঁহারা দর চড়াইয়া ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করিয়া লন। এইরূপ ইউরোপ হইতে এ দেশে যে মদ আমদানি হয় তাহার মাশুলও অপ্রত্যক্ষ কর, কারণ সুরাব্যবসায়ীরা গভর্ণমেণ্টকে যে মাশুল দেন তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সুরাপায়ীরাই দিয়া থাকে। তামাকের উপর গভর্ণমেণ্ট মাশুল বসান নাই, যদি বসাইতেন তাহা হইলে ইহাও অপ্রত্যক্ষ কর হইত।

প্রত্যক্ষ কর আদায় করিতে গভর্ণমেণ্টকে বিস্তর ঝঞ্চট পোয়াইতে হয়, কারণ এই কর আদায় করিতে গেলে প্রত্যেক প্রজার আর্থিক অবস্থা ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। ইন্‌কম ট্যাক্স আদায়ের জন্য রাজ্যের সর্ব্বত্র আসেসর নিযুক্ত করিতে হইয়াছে, আসেসরগণ বাড়ী বাড়ী গিয়া কাহার কত টাকা আয় তাহার অনুসন্ধান করেন, অনুসন্ধানে ঠিক সন্ধান সকল সময় পান না, অনুমানের উপর অনেক সময় নির্ভর করিতে হয়, তাহাতে করদাতার প্রতি অবিচার ঘটিবার সম্ভাবনা। যে সকল করদাতার ধর্ম্মবুদ্ধি ক্ষীণ তাহারা উৎকোচের প্রলোভন দেখাইতে ত্রুটি করে না, তাহাতেও অন্যায় অবিচার ঘটিতে পারে। অতএব প্রত্যক্ষ-কর-সংগ্রহে গভর্ণমেণ্টের ব্যয় অধিক পড়ে, প্রজার উপর উপদ্রব ঘটিবার সম্ভাবনা রাজার প্রতি প্রজার অসন্তোষ-সঞ্চারেরও সম্ভাবনা।

অপ্রত্যক্ষ-কর-সংগ্রহে এ সকল অসুবিধা নাই, অথচ প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা ইহা হইতে অধিক আয় হইয়া থাকে। এই লবণ-করের কথাই ধর। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ধনী, নির্ধন যাবতীয় লোকের নিতান্ত প্রয়োজনীয় এই সামগ্রীর উপর বহুকাল হইতে গভর্ণমেণ্ট শুল্ক গ্রহণ করিতেছেন, তথাপি লোকে তাদৃশ অসন্তোষ প্রকাশ করে না,

কারণ লবণের জন্য ট্যাক্স যে দিতে হইতেছে এ কথা সাধারণ অনভিজ্ঞ লোকের মনে উদয়ই হয় না। অপ্রত্যক্ষ করে গভর্মেণ্টকে প্রজার বিরাগভাজন হইতে হয় না, আয়ও বিলক্ষণ হয়।

একাল ও সেকালের করগ্রহণ।

ভারতবাসীকে মুসলমান সম্রাট্‌দিগের আমলে যত কর দিতে হইত তাহা অপেক্ষা এখন কি অধিক কর দিতে হইতেছে? এডওয়ার্ড টমাস সাহেব অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন, ১৬৯৫ সালে সম্রাট্‌ আওরংজেবের ৮০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছিল; বৃটিশ ভারতবর্ষে কিন্তু ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৯ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে গড়ে বৎসর ৪০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা মাত্র রাজস্ব আদায় হইয়াছিল, ইহার ভিতর অহিফেনের রাজস্ব ধরা হয় নাই, কারণ ইহা "চীনবাসীদিগের নিকট হইতেই প্রধানতঃ আদায় হইয়া থাকে," ভারতবাসীর নিকট হইতে বড় অধিক আদায় হয় না। এই হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় মুসলমান রাজারা প্রজার নিকট হইতে ইংরাজ-রাজ অপেক্ষা অধিক কর আদায় করিতেন। সেকালে ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা এখন অপেক্ষা অনেক কম ছিল, অল্পসংখ্যক প্রজার নিকট হইতে যখন এত অধিক রাজস্ব আদায় হইত তখন মুসলমান রাজারা যে অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বকালে প্রজাকে যে কেবল অধিক কর দিতে হইত তাহা নহে, সেকালে ট্যাক্সের কিছুই স্থিরতা ছিল না, সম্রাটের রাজস্ব-কর্ম্মচারীরা জুলুম জবরদস্তি করিয়া প্রজার নিকট হইতে ইচ্ছামত ট্যাক্স আদায় করিতেন, যাহা আদায় করিতেন, তাহার সমুদয়ও রাজকোষে স্থান পাইত না। এ সম্বন্ধে ইংরাজশাসনে প্রজার সুখ বাড়িয়াছে। ইংরাজ গভর্মেণ্ট ব্যবস্থাপক-সভা হইতে আইন পাশ করাইয়া তবে কর নির্দ্ধারণ ও কর সংগ্রহ করিয়া থাকেন,

বেআইনী করিয়া ট্যাক্স আদায় করিবার কাল আর নাই। প্রজা এখন বুঝিতেছে, গভর্মেণ্টের রাজস্ব-কর্ম্মচারীরা অমুক কর এত হারে আদায় করিতে পারেন, ইহার অধিক আদায় করিলে তাঁহাদিগকে দণ্ডিত হইতে হইবে। এটা বড় সামান্য সুখের কথা নয়। ইংরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী শাসক অনুশাসকেরা জমির খাজনা ব্যতীত অন্যূন চল্লিশ প্রকারের কর আদায় করিতেন। ইংরাজীতে যাহাকে "পোল-ট্যাক্স" বলে তাহা সম্রাট্ আওরংজেবের আমলেই আদায় হইত। মাথা গণিয়া লোক পিছু ট্যাক্স আদায় করা আওরংজেবের ন্যায় উপদ্রবী সম্রাটের শাসনকালেই সম্ভব। এখন যদি কোন দরিদ্র গৃহস্থকে বলা যায় তোমার বাটীতে যে কয়জন পুরুষ আছেন তাঁহাদের প্রত্যেককে ৪০৲, ২০৲ অথবা ১০৲ টাকা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে গভর্মেণ্টের এইরূপ আদেশ বাহির হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিতই শিরে করাঘাত করিবেন, ভাবিবেন ইহা অপেক্ষা মগের মুল্লুকে যাইয়া বাস করা ভাল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আইন আদালত।

সভ্যদেশ মাত্রেই আইন আদালত আছে। যে রাজ্যে প্রজা আইনের আশ্রয় লইতে পারে না, প্রবলের অত্যাচার হইতে বিচারপতির শরণাপন্ন হইতে পারে না সেখানে উপদ্রবের স্রোত প্রবল বেগে বহিয়া থাকে, প্রজার ধন মান প্রাণ নিরাপদ হইতে পারে না। ইংরাজ জাতি আইনের অতিশয় অনুগত, এই জন্য ভারত-শাসনের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা উপস্থিত প্রয়োজনানুসারে নানা প্রকার

আইনের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ও বিচারপতি নিযুক্ত করিয়াছেন। অধস্তন দেওয়ানী বিচারপতির নাম মুন্সিফ, অধস্তন ফৌজদারী বিচারপতির নাম সব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। মুন্সিফের উপর আছেন সবডিনেট জজ, তাঁহার উপর ডিষ্ট্রিক্ট জজ। সব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর আছেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁহার উপর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁহার উপর ডিষ্ট্রিক্ট জজ। এই উভয়বিধ বিচারপতি শ্রেণীর শীর্ষস্থানে এক এক প্রদেশে হাইকোর্ট আছে। হাইকোর্টের জজেরা দেওয়ানী ফৌজদারী উভয়বিধ মকদ্দমার আপিল শুনিয়া থাকেন, ইহা ব্যতীত তাঁহাদের অন্যান্য অনেক কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে। কলিকাতায় বঙ্গ প্রদেশের, এলাহাবাদে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের, বোম্বাই নগরে বোম্বাই প্রদেশের এবং মাদ্রাজে মাদ্রাজ প্রদেশের হাইকোর্ট আছে। এই চারিটী প্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র হাইকোর্ট নাই। পঞ্জাবের উচ্চতম আদালতের নাম "চীফ কোর্ট," ইহাতে তিন জন জজ বসেন; মধ্যপ্রদেশ ও অযোধ্যায় উচ্চতম বিচারপতির নাম "জুডিশিয়াল কমিশনর"। আসাম কলিকাতা হাইকোর্টের অধীন।

ফৌজদারী আদালত।

ফৌজদারী আইনের মধ্যে দুইটী প্রধান। (১) "পিনাল কোড" অর্থাৎ দণ্ডবিধি আইন। অপরাধ কয় প্রকার এবং কোন্ অপরাধে কত দণ্ড হইতে পারে তাহা এই আইনে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (২) "ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন"। কোন ব্যক্তির নামে কোন অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলীশ কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিবেন, কোথায় "শমন" বাহির করিবার আদেশ দেওয়া যাইবে, কোথায় "ওয়ারেন্ট" বাহির করিবার আদেশ দেওয়া যাইবে এইরূপ নানা কথা এই আইনে আছে।

মহকুমায় ফৌজদারী মকদ্দমা রুজু করিতে হইলে মহকুমার কর্ত্তা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাহা করিতে হইবে। জেলায় স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে তিনি ফরিয়াদীকে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মকদ্দমার গুরুতা অনুসারে হয় স্বয়ং তাহার বিচার করিবেন, না হয় অধীনস্থিত আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা ডেপুটি, সব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের সেরেস্তায় মকদ্দমা পাঠাইয়া দিবেন।

ক্ষমতা অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট এক মাসের অনধিক কাল কারাবাসের আদেশ দিতে পারেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড করিতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাবাস ও ২০০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ডের আদেশ করিতে পারেন। যাহারা প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা পাইয়াছেন তাহারা দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস এবং ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ডের আদেশ দিতে পারেন। ম্যাজিষ্ট্রেট যদি এরূপ বুঝেন যে বিচারাধীন মকদ্দমায় আসামীদিগের ইহা অপেক্ষাও অধিক দণ্ড হওয়া উচিত তাহা হইলে তিনি ঐ মকদ্দমা দায়রা অর্থাৎ সেসন্স আদালতে পাঠাইবেন।

দায়রার মকদ্দমা সেসন্স জজের হাতে হইয়া থাকে, তবে যেখানে স্বতন্ত্র সেসন্স জজ নাই সেখানে ডিষ্ট্রিক্ট জজ স্বয়ং সেই মকদ্দমার বিচার করিয়া থাকেন। দণ্ডবিধান সম্বন্ধে সেসন্স জজের হস্তে অসীম ক্ষমতা আছে, তিনি প্রাণদণ্ডের পর্য্যন্ত আদেশ দিতে পারেন, কিন্তু এই আদেশ প্রদেশীয় হাইকোর্টের অনুমোদিত না হইলে আসামীর ফাঁশি হইতে পারে না। আসিষ্টাণ্ট সেসন্স জজেরা প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে পারেন না, আর সাত বৎসরের অধিক কালের জন্য কারাবাসে অথবা দ্বীপান্তরে পাঠাইতে পারেন না।

জুরির বিচার।

সেসন্স জজ কোন কোন জেলায় জুরি লইয়া বিচার করেন, অনুন্নত জেলায় তিন জন আসেসর লইয়া বিচার করেন। জেলার যে যে ব্যক্তি জুরি হইবার উপযুক্ত তাঁহাদের নাম গভর্ণমেণ্ট গেজেটে বৎসর বৎসর প্রকাশিত হয়। দায়রা বসিবার কতিপয় দিবস পূর্ব্বে তাঁহাদের নামে শমন বাহির হয়, শমন অনুসারে নির্দ্দিষ্ট দিনে সেসন্স আদালতে উপস্থিত না হইলে জজ মহোদয়ের অবমাননা করা হয়, এই জন্য অনুপস্থিত জুরির অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। আসামীর বিচারান্তে জজ জুরিকে উভয় পক্ষের সাক্ষ্যের সারাংশ বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে কক্ষান্তরে প্রস্থান করিতে বলেন। জুরি মহাশয়েরা একমত হইয়া "আসামী অপরাধী" অথবা "অনপরাধী" এই কথা বলিলে জজ দণ্ডাদেশ দেন! যদি জুরির সহিত জজের মতভেদ হয় তাহা হইলে জজ মহোদয় মকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠাইয়া দেন। ইংল্যাণ্ডের লোকের নিকট জুরির বিচার বহুমূল্য বস্তু, কারণ তাঁহারা ভাবেন একজন ব্যক্তির বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া পাঁচ জনের মত লইয়াই এক জনের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাকে জেলে পাঠান উচিত। বিশেষতঃ সেসন্স আদালতে খুন ডাকাইতি প্রভৃতি গুরুতর অপরাধেরই বিচার হইয়া থাকে, এরূপ স্থলে যদি বিচারপতির ভ্রমবশতঃ একজনকে বৃথা দ্বীপান্তর বাস করিতে অথবা ফাঁশি যাইতে হয় তাহা হইলে প্রকৃতই বড় শোচনীয় ব্যাপার হইবে।

দেওয়ানী আদালত।

স্বত্বাস্বত্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় মকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে হইয়া থাকে। তুমি বলিলে এই দুই হাত জমি আমার, শ্যামাচরণ বলিল এ জমি তোমার নহে; এরূপস্থলে বিবাদভঞ্জন করিতে গেলে দেওয়ানী আদালতে মুন্সিফের নিকট মকদ্দমা রুজু করিতে হইবে। দেনা পাওনা সংক্রান্ত মকদ্দমাও দেওয়ানী আদালতে হইয়া থাকে, তবে যে

যে জেলায় এই শ্রেণীর মকদ্দমার জন্য "ছোট আদালত" নামে স্বতন্ত্র বিচারালয় আছে সেখানে পাওনাদারকে এই আদালতেরই আশ্রয় লইতে হয়।

বঙ্গে চারি শ্রেণীর মুন্সিফ আছেন। ১ম শ্রেণীর মুন্সিফ ৪০০ টাকা, ২য় শ্রেণীর ৩০০ টাকা, ৩য় শ্রেণীর ২৫০ এবং ৪র্থ শ্রেণীর মুন্সিফ ২০০ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। ১ম শ্রেণীর মুন্সিফের পদোন্নতি হইলে তাঁহারা "সবর্ডিনেট জজ" বা "সদর আলার" পদে প্রতিষ্ঠিত হন। নিম্নশ্রেণীর সদর আলা ৬০০ টাকা, তদূর্দ্ধশ্রেণীর ৮০০ টাকা এবং ১ম শ্রেণীর সদর আলা ১০০০ টাকা বেতন পান।

সাধারণতঃ ১০০০ টাকার কম দাবির মকদ্দমা মুন্সিফের নিকট হইয়া থাকে, ইহার উপর যত টাকারই দাবি হউক না কেন সে মকদ্দমার বিচার সব জজ মহাশয়েরা করিতে পারেন। ডিষ্ট্রিক্ট জজ মহোদয়ের অধিকাংশ সময় জেলার মুন্সিফদিগের কার্য্য পরিদর্শনে এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আপিলের বিচার করিতেই অতিবাহিত হয়। ৫০০০ টাকার কম দাবির মকদ্দমার আপিল জেলার জজের নিকট হইয়া থাকে, ইহার অধিক দাবি হইলে হাইকোর্টে আপিল করিতে হয়।

হাইকোর্ট।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ চারিটী হাইকোর্ট আছে। কলিকাতা হাইকোর্টে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩ জন জজ আছেন, ইহার মধ্যে ১০ জন সাহেব, দুই জন হিন্দু এবং একজন মুসলমান। হিন্দু দুইজন পূর্ব্বে হাইকোর্টের উকিল ছিলেন, মুসলমান জজ পূর্ব্বে এই হাইকোর্টেই ব্যারিষ্টারি করিতেন। ইঁহাদের সর্ব্বপ্রধানের নাম "চীফ জষ্টিস্." বেতন বার্ষিক ৭২০০০ টাকা। অবশিষ্ট বিচারপতিদিগকে "পিউনি জজ" কহে, ইঁহাদের বার্ষিক বেতন ৪৮০০০ টাকা। জজ মহোদয়গণ বিচারকার্য্যে ছোট লাট অথবা বড়লাট বাহাদুরের আজ্ঞাবহ নহেন।

ইঁহাদের কৃত নিস্পত্তির আপিল বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে হইয়া থাকে।

অত্রত্য হাইকোর্টের দুইটী বিভাগ আছে, একটীর নাম "ওরিজিন্যাল সাইড" অপরটীর নাম "আপিল বিভাগ"। নিজ কলিকাতা নগরীর স্বত্বাস্বত্বের মকদ্দমা ওরিজিন্যাল সাইডে হইয়া থাকে ; বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সকল জেলারই দেওয়ানী ও ফৌজদারী আপিল হাইকোর্টের আপিল বিভাগে হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত হাইকোর্টে একটী সেসন্স আদালত আছে, কলিকাতা পুলীশকোর্টের প্রেরিত মকদ্দমার বিচার হাইকোর্টের দায়রায় হইয়া থাকে। হাইকোর্টের একতম জজ দায়রার বিচারাসনে বসিয়া থাকেন।

প্রদেশীয় তাবৎ বিচারপতিই হাইকোর্টের শাসনাধীন। মুন্সিফগণ ত হাইকোর্ট হইতেই মনোনীত হইয়া থাকেন ; ম্যাজিষ্ট্রেটগণ প্রদেশীয় গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইলেও বিচারকার্য্যে তাঁহাদিগকে হাইকোর্টের আদেশ শিরোধার্য্য করিতে হয়। কোন ম্যাজিষ্ট্রেট যদি বুদ্ধির দোষে কোন অবিচার করিয়া বসেন হাইকোর্টে জানাইলে তাহার প্রতিকার হয়। হাইকোর্টের জজেরা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ উল্‌টাইয়া দিতে পারেন, অথবা মকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের আদেশ করিতে পারেন। হাইকোর্টের জজেরা আইনের যে ব্যাখ্যা করিবেন তাহাই মানিয়া দেশশুদ্ধ বিচারপতিকে চলিতে হয়।

প্রজাবৎসল গভর্মেণ্ট প্রজার কল্যাণ-কামনায় বহুবিধ বিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সুবিচারের ব্যবস্থা করিয়া ইংরাজরাজ এদেশীয়দিগের যেরূপ অনুরাগ-ভাজন হইয়াছেন সেরূপ বোধ হয় আর কিছুতে হন নাই। পূর্ব্বকালে রাজার অধস্তন কর্ম্মচারীরা হাতে মাথা কাটিতেন, অত্যাচরিত প্রজা রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রতিকার লাভ করিত না। এখন অধস্তন রাজপুরুষেরা কোন প্রকার অত্যাচার করিলে জেলার বড় সাহেবের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করা যায়,

ইনি মনোযোগ না করিলে জেলার জজের কাছে অথবা বিভাগীয় কমিশনরের কাছে আবেদন করিতে পারা যায়। বিচারকার্য্যে বিভ্রাট ঘটিলে হাইকোর্টের পর্য্যন্ত শরণাপন্ন হইতে পার। হাইকোর্টের জজেরা প্রবীণ, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, আইনজ্ঞ, রাগদ্বেষ-বর্জ্জিত এবং নিরপেক্ষ। ইঁহারা যথার্থই ধর্ম্মাবতার। এই ধর্ম্মাবতারদিগের হস্তে প্রজার ধন মান প্রাণ ও স্বাধীনতা সমর্পণ করিয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পুলীশ।

সমগ্র বৃটিশ ভারতবর্ষে ১৮৮২ সালে ১৪৫৪০১ জন পুলীশ কর্ম্মচারী ও কনষ্টেবল ছিল। ইহার মধ্যে গ্রাম্য চৌকিদারদিগকে ধরা হইল না। এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে গড়ে প্রতি ১৩৬৯ জন প্রজাকে শাসনে রাখিবার জন্য এক জন করিয়া পুলীশের লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের সাধারণ অধিবাসিবর্গ যদি দুর্দ্দান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হইত, তাহা হইলে কি এক জন মাত্র কনষ্টেবল ১৩।১৪ শত লোককে শাসিত করিতে পারিত? পুলীশ প্রহরীর স্বল্পতা হইতেই বুঝা যাইতেছে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক নিরীহ ও রাজনিয়ম-প্রতিপালনে তৎপর। ইউরোপীয় জাতিরা শিক্ষাগুণে আইনের মর্য্যাদারক্ষণে যত্নবান্, এদেশীয়েরা স্বভাবসিদ্ধ শান্তিপ্রিয়তাগুণে রাজবিধির অমর্য্যাদায় পরাঙ্মুখ। তাহা বলিয়া সকলেই যে শান্তপ্রকৃতি এবং আইনের মান রাখিয়া চলেন এ কথা বলা যাইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে মুসলমানের পর্ব্বোপলক্ষে গোহত্যা লইয়া অথবা প্লেগ-বিধি পরিচালন লইয়া চারিদিকে এত দাঙ্গাহাঙ্গামা হইত না; ভদ্র অভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই যদি সাধুস্বভাব হইত তাহা হইলে

প্রতি বৎসরে আড়াই কোটি তিন কোটি টাকা খরচ করিয়া পুলীশ প্রহরী রাখিবার প্রয়োজন হইত না।

চুরি, ডাকাইতি, নরহত্যা, পরস্ত্রীহরণ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, জাল, প্রতারণা প্রভৃতি যে সকল অপরাধের কথা দণ্ডবিধি আইনে উক্ত হইয়াছে তাহা কেহ না কেহ করিতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা বুঝিয়াই ত ১৮৬০ সালে লর্ড মেকলে পিনাল কোডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই সকল অপরাধ যাহাতে সংঘটিত না হয় এবং সংঘটিত হইলে যাহাতে অপরাধীরা দণ্ডিত হয় তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টকে পুলীশ বিভাগের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। এই বিভাগের শীর্ষদেশে "ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব পুলীশ" আছেন, পাদমূলে পাহারাওয়ালারা আছে, মধ্যে এক এক জেলায় এক এক জন পুলীশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তদধীনে ইনস্পেক্টর, সব ইনস্পেক্টর ও হেড কনষ্টেবল আছেন। কলিকাতার ন্যায় রাজধানী নগরের প্রধানতম শান্তিরক্ষকের নাম "কমিশনর অব পুলীশ," ইঁহার নীচে "ডেপুটি কমিশনর অব পুলীশ," সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইনস্পেক্টর, সব ইনস্পেক্টর প্রভৃতি পুলীশ কর্ম্মচারী আছেন। সাধারণ পুলীশকে সাহায্য করিবার জন্য "ডিটেক্‌টিভ" অর্থাৎ গোয়েন্দা পুলীশ আছেন। ডিটেক্‌টিভ পুলীশেও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইনস্পেক্টর, সব ইনস্পেক্টর আছেন। ইঁহাদিগকে পুলীশ-পরিচ্ছদ পরিতে হয় না, সাধারণ ভদ্রলোকের বেশ ধারণ করিয়া অপরাধীর অনুসন্ধানে ইঁহাদিগকে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এক এক পুলীশ বিভাগের নাম থানা। এক এক জেলায় কয়েকটা করিয়া এইরূপ থানা আছে। পুলীশ ইনস্পেক্টরেরাই থানার কর্ত্তা। ইঁহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে পুলীশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট এবং অপ্রত্যক্ষভাবে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। এক এক থানার অধীনে কতকগুলি

করিয়া "আউট পোষ্ট" অথবা ফাঁড়ি আছে। হেড কনষ্টেবলেরাই আউট পোষ্টের কর্ত্তা। গ্রামবাসীরা ইঁহাকে "জমাদার সাহেব" বলিয়া সবহুমান সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

মিউনিসিপ্যালিটীর বাহিরে যে সকল গ্রামে পঞ্চায়ত-প্রথা প্রচলিত, সেখানে চৌকিদারেরা প্রহরীর কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারা পঞ্চায়তের নিকট হইতে বেতন পায়, পঞ্চায়ত গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় করিয়া চৌকিদারের বেতন দিয়া থাকেন। গ্রাম্য চৌকিদারেরা ভাল কাজ করে কি পুলীশ বিভাগের কনষ্টেবলেরা ভাল কাজ করে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যে সকল স্থানে পূর্ব্বে চৌকিদার ছিল, কিন্তু এখন গ্রামের অবস্থা উন্নত হওয়াতে পাহারাওয়ালার বন্দোবস্ত হইয়াছে সেইখানকার প্রাচীন লোকে বলিয়া থাকেন, সে কালের চৌকিদার ছিল ভাল; তাহারা বদমাস লোক চিনিত, রাত্রে বাড়ী বাড়ী যাইয়া গৃহস্থকে দুইবার জাগাইয়া সাবধান করিয়া দিত; এখনকার সভ্য অধিবাসীরা চৌকিদারের চীৎকারে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইতে চান না বলিয়া সভ্য সুপরিচ্ছদ পাহারাওয়ালারাও রাত্রে গৃহস্থকে জাগরিত করে না।

পূর্ব্বকালে গ্রাম্য চৌকিদারেরা বেতন পাইত না, সেকালের জমিদারেরা ইহাদিগকে জমি দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। এইরূপ জমির নাম "চাক্‌রান" জমি। এই চাক্‌রান জমি চৌকিদারেরা পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছিল, পুরুষানুক্রমে ইহারা গ্রাম চৌকি দিয়াও আসিতেছিল। কিন্তু চৌকিদার এরূপ ভাবিতে পারে, জমিদার মহাশয়ের জমিতে আমি বাস করিতেছি, গ্রামবাসী অন্যান্য ভদ্রলোকেও পর্ব্বোপলক্ষে আমাকে পার্ব্বণী দিয়া থাকেন, ইঁহারাই আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন, আমি ইঁহাদের এক প্রকার ভৃত্য। গভর্মেণ্ট মনে করিলেন, চৌকিদারেরা গ্রামবাসীদের এরূপ অনুগত হওয়াতে নিরপেক্ষভাবে

কার্য্য করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব, অতএব তাহাদের এই প্রতিপাল্য-প্রতিপালক-সম্বন্ধ দূর করা কর্ত্তব্য। এই জন্য চাক্‌রান জমিগুলি গভর্মেণ্ট জমিদারকে প্রত্যর্পণ করিলেন, চৌকীদারী ট্যাক্স আদায়ের বন্দোবস্ত করিলেন, গভর্মেণ্টের মনোনীত পঞ্চায়তের নিকট হইতে চৌকিদার মাহিয়ানা পাইবে এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন, প্রদত্ত বেতনের হিসাব বহি মাসে মাসে থানায় পাঠাইবার নিয়ম করিলেন, নিয়মিত-রূপে বেতন দেওয়া না হইলে পঞ্চায়তদিগকে দণ্ডিত করিতে আরম্ভ করিলেন। চৌকিদার বুঝিল আমি এখন গভর্ন্মেণ্টের চাকর, জমিদার ও গ্রামস্থ ভদ্রলোকের আর তোয়াক্কা রাখি না। গ্রামস্থ লোকেরা ভাবিল এত দিন আমাদের বিনা ব্যয়ে সম্পত্তি রক্ষা হইতেছিল, এখন আমাদিগকে ইহার জন্য ট্যাক্স দিতে হইবে, ইহাতে আমাদের লাভ কি? চৌকিদারকে যে এতকাল এক পয়সাও বেতন দিতে হয় নাই ইহাই তাঁহাদের লাভ, আর গ্রাম্য চৌকিদার হইতে উচ্চতম পুলীশ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই যে এক প্রভুশক্তির অধীন হইলেন ইহাই গভর্মেণ্টের লাভ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি পুলীশ-সৃষ্টির একটী উদ্দেশ্য দুষ্কৃতি-নিবারণ, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কৃতাপরাধ দুরাত্মাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে আনয়ন, তৃতীয় উদ্দেশ্য সম্পত্তি-রক্ষা, চতুর্থ উদ্দেশ্য শান্তি-রক্ষা। তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্দেশ্য প্রথম উদ্দেশ্যেরই অন্তর্গত। সকল উদ্দেশ্যেরই মূলে প্রজার কল্যাণ-কামনা ও রাজ্যশাসনের চিন্তা রহি-য়াছে। পুলীশ ব্যতিরেকে রাজপুরুষদিগের অনেক কাজই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। পুলীশ, ম্যাজিষ্ট্রেটের দক্ষিণ হস্ত, ইহারই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পুলীশ অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া ইহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে কিন্তু আইনে পুলীশকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে পুলীশকর্ম্মচারী ব্যক্তিবিশেষকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে ওয়ারেণ্ট লইতে

হয় না। ওয়ারেণ্ট ব্যতিরেকে পুলীশ কিরূপ স্থলে গ্রেপ্তার করিতে পারেন তাহা নিম্নে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে।

মনে কর এক ব্যক্তি দাঙ্গা করিবার জন্য কতকগুলি লাঠিয়াল কি গুণ্ডা জমা করিয়াছে, ইহাদিগকে টাকা দিয়া অন্য স্থান হইতে আনাইয়াছে। পুলীশ সংবাদ পাইলে ঐ ব্যক্তিকে অথবা ঐ সকল বদ্‌মাসকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিতে পারেন। ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে যাইতেছেন এমন সময় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে ছিনাইয়া লইল, পাহারাওয়ালাদিগকেও প্রহার করিল; এরূপ স্থলে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে। আর যদি এমন হয়, এক ব্যক্তি পুলীশের লোক নয় কিন্তু পুলীশের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া উহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে তাহা হইলে ঐ নকল-পুলীশকেও বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করিলে বে-আইনি কাজ হইবে না। পুলীশের লোক যদি আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করিতে আসেন অথবা কোন বৈধ কর্ত্তব্যসম্পাদনের চেষ্টা করেন, আর সেই সময়ে কেহ তাঁহাকে বাধা দেয় তাহা হইলে গুরুতর অপরাধ করা হইল, সে অপরাধে ঐ ব্যক্তিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের অপেক্ষা না করিয়া গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে। ফল কথা এই, পিনাল কোডে নির্দ্দেশিত যত গুরুতর অপরাধ আছে তাহাতে কোন ব্যক্তি লিপ্ত আছে এ কথা বিশ্বাস অথবা সন্দেহ করিবার হেতু থাকিলেই পুলীশ ইচ্ছা করিলে গ্রেপ্তার করিতে পারেন। আর কোন লোকের কাছে যদি সিঁদ কাটিবার যন্ত্র থাকে তাহা হইলেও সে গ্রেপ্তার হইবে; তবে যদি সে আপনার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা যাইবে না।

ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষরিত ওয়ারেণ্ট লইয়া যদি পুলীশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে যান তাহাতে প্রজার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হইবে এরূপ আশঙ্কা করা অসঙ্গত, কারণ ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়গণ সুশিক্ষিত

ও সুবিবেচক। ওয়ারেণ্ট ব্যতিরেকে কোন প্রজাকে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা যদি অৰ্দ্ধশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত পুলীশের হস্তে থাকে তাহা হইলে প্রজার আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু সে আশঙ্কা দূর করিবার উপায় নাই। গভর্মেণ্ট সাধারণ সমাজের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন; যদি পুলীশের হস্তে উল্লিখিত ক্ষমতা না থাকিত তাহা হইলে দেশে অপরাধের স্রোত প্রবল বেগে বহিত, লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ থাকিত না। বোধ কর, এক ব্যক্তি এমন জোরে গাড়ি কি ঘোড়া হাঁকাইয়া যাইতেছে যে তাহাতে পথিক মারা যাইতে পারে, এরূপ স্থলে যদি পুলীশ শকট-চালক কি অশ্বারোহীকে গ্রেপ্তার না করেন তাহা হইলে সাধারণ লোকের বিপদ ঘটিতে পারে। অথবা মনে কর মাঝি জীর্ণ নৌকায় অসম্ভব লোক বোঝাই করিয়াছে; পুলীশ যদি মাঝিকে গ্রেপ্তার না করেন তাহা হইলে আরোহীরা জলমগ্ন হইতে পারে। হত্যাকারী অথবা হত্যাকরণোদ্যত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বে দূরস্থিত ম্যাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্টের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে কেমন করিয়া চলিবে? আর যখন গৃহস্থের বাড়ী ডাকাইত পড়ে পড়ে হইয়াছে, কি পড়িয়াছে, তখন ফাঁড়িতে ফিরিয়া গিয়া পর দিন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে ওয়ারেণ্ট বাহির করিবার চেষ্টা করিলে কি সমাজ নিরাপদ হইবে? চোর ডাকাইতের নিকট হইতে যাহারা চোরাই মাল সস্তায় কিনিয়া থাকে তাহাদিগকে পুলীশ বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করিতে পারেন বলিয়াই চোরাই মালের কিনারা সহজে হয়। চৰ্ম্ম-কারেরা চর্ম্মের লোভে বিষমিশ্রিত খাদ্য সামগ্রী খাওয়াইয়া গোবধ করিয়া থাকে, পুলীশ এই নরাধমদিগকে বিনা ওয়ারেণ্টে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারেন তাই গোপালক গৃহস্থের নিস্তার। বৈরসাধন বাসনায় যাহারা অপরের গৃহদাহে কুণ্ঠিত হয় না সেই নরপিশাচদিগকে পুলীশ অগ্নিদানকালেই যদি গ্রেপ্তার করিতে পারেন ভালই, নচেৎ অন্য সময়ে

গ্রেপ্তার করিবেন, ওয়ারেণ্টের প্রতীক্ষায় থাকিলে অপরাধী পলায়ন করিতে পারে। এইরূপ, প্রভু যদি কর্ম্মচারি-বিশেষকে বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট টাকাকড়ি জিনিশপত্র রাখেন; মহাজন যদি গাড়ি-ওয়ানকে বিশ্বাস করিয়া স্থানান্তরে মাল পাঠাইয়া দেন, আর ইহারা বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া যদি তাহা আত্মসাৎ করে তাহা হইলে আইন অনুসারে ওয়ারেণ্ট ব্যতিরেকে পুলীশ ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন। বিল সরকার অথবা নায়েব গোমস্তা যদি টাকা আদায় করিয়া সরকারে জমা না দিয়া অন্তর্দ্ধান করে তাহা হইলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার যে বিধান আছে তাহাও কল্যাণকর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আইনে পুলীশের হস্তে যে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহার অপপ্রয়োগ করিলে অবশ্য হিতে বিপরীত হইতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন?

এই আশঙ্কিত অনিষ্ট দূর করিবার জন্য বঙ্গীয় গভর্মেণ্ট পুলীশ বিভাগে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। এখন ফৌজদারী আইন, নক্সা, ইংরাজী রচনা প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সব-ইনস্পেক্টরের পদে লোক নিযুক্ত করা হইতেছে। এইরূপে ক্রমশঃ সুশিক্ষিত ইন্‌স্পেক্টর ও সব-ইন্‌স্পেক্টরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে প্রজার আক্ষেপ ও অসন্তোষের কারণ অন্তর্হিত হইতে পারে। প্রজারও একটু অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। এখন অধিকাংশ প্রজা আপনার অধিকার ও পুলীশের ক্ষমতা কি তাহা বুঝেন না। পুলীশ আসিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া খানাতল্লাসি করিতে পারেন কি না, অথবা বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করিতে পারেন কি না তাহা জানা থাকিলে পুলীশ বেআইনি করিতে সাহসী হইবেন না। আর পুলীশের প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিয়া রাখিলে রাজা প্রজা উভয়েরই মঙ্গল। পুলীশ রাজার আদেশ পাইয়া কার্য্য করিতেছেন, তুমি প্রজা হইয়া রাজার সেই আদেশ প্রতিপালনে সাহায্য না

করিলে প্রজার মত কার্য্য করা হয় না। পুলীশের বৈধকার্য্যে বাধা দেওয়া ও রাজার অবমাননা করা উভয়ই সমান।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সেনা-বিভাগ।

সাধারণ প্রজামণ্ডলীর মধ্যে শান্তিরক্ষার জন্য যেমন পুলীশের প্রয়োজন, সেইরূপ রাজ্যের অভ্যন্তর প্রদেশে বিদ্রোহ দমন এবং সীমান্ত প্রদেশে বহিঃশত্রুর পদ-প্রসারণ নিবারণ জন্য সৈনিক রক্ষার আবশ্যকতা আছে। বৃটিশ ভারতে প্রজাবিদ্রোহের আশঙ্কা নাই, ১৮৫৭ সালের ন্যায় সৈন্যবিদ্রোহেরও সম্ভাবনা নাই। এখন সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে; সর্ব্বজাতীয় প্রজা ইংরাজশাসনে বিবিধরূপে উপকৃত হইয়া ইহার স্থায়িত্ব কামনা করিতেছে; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে মুসলমান, মহারাষ্ট্রীয়, শিখ প্রভৃতি যে সকল জাতি স্বদেশীয় অন্য কোন জাতি অথবা দক্ষিণ-ভারত-প্রবাসী ফরাসী জাতির সহায়তায় ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহাদের সন্ততিগণ এখন লেখনাচালনা অথবা হলচালনা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। শান্তিপ্রিয়তা এখন সমরপ্রিয়তার স্থান অধিকার করিয়াছে। সুতরাং প্রজা-শাসনের জন্য বৃটিশ বন্দুক তরবারি রণতরীর আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দুর্দান্ত আফগান জাতির বাস, সেই আফগান জাতির পশ্চাৎ রুশরাজের অনুচরেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মার্ভ নামক স্থান অতিক্রম করিয়া রুশ-রেলপথ অগ্রসর হইয়াছে, ফলতঃ শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের ব্যপদেশে রুশ ক্রমশঃ সমগ্র মধ্য-এশিয়া গ্রাস করিয়াছেন। এদিকে ব্রহ্মের দক্ষিণপ্রান্তে লব্ধপ্রবেশ ফরাসীগণ চীনের সহিত ইঙ্গিত-আভাসে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। এ অবস্থায় ভারত-লোলুপ রুশ

ফরাসীর হস্ত হইতে এই রাজ্যরত্নকে নিরাপদ করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া ইংরাজরাজ ভারতের নানা স্থানে বিপুল সেনা-সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গে, মাদ্রাজে ফোর্ট সেণ্টজর্জ্জ নামক দুর্গে এবং বোম্বাই নগর ব্যতীত ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই সৈন্য-নিবাস আছে। নিজ বাঙ্গালায় দমদমা ও বারাকপুর ব্যতীত অন্যত্র সৈনিক-নিবাস বড় একটা নাই। বিহার প্রদেশীয় দানাপুরে; মধ্যপ্রদেশে মাউ, সাগর, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বারাণসী, কাণপুর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ফয়জাবাদ, আগ্রা, মিরাট, বেরিলি প্রভৃতি নগরে; পঞ্জাব প্রদেশে দিল্লী, জলন্ধর, মিয়াঁমির, অম্বালা, রাবলপিণ্ডি প্রভৃতি নগরে সৈনিক-নিবাস আছে। এতদ্ব্যতীত পুনা, বাঙ্গালোর, বেলগাঁও, সাতার, আমেদনগর, ঝাঁশি, মুলতান, করাচি, হায়দ্রাবাদ, কোয়েটা, সিলং, মণিপুর, রাঙ্গুন, ম্যাণ্ডলে, থায়েটমায়ো, লোহিত সাগরোপকূলবর্ত্তী এডেন, আন্দামান দ্বীপস্থিত পোর্টব্লেয়ার প্রভৃতি বহুস্থানে ইংরাজ ও দেশীয় সেনা সন্নিবেশিত আছে। সমুদয়ে ভারতবর্ষে সৈনিক ও সেনানী লইয়া ৭৩০০০ ইংরাজ এবং ১৩৩০০০ এদেশীয় লোক আছে।

কোম্পানির আমলে বৃটিশ ভারতবর্ষ যে তিনটি প্রেসিডেন্সিতে বিভক্ত হইয়াছিল তদনুসারে বঙ্গীয় সেনা, মাদ্রাজী সেনা এবং বোম্বাই সেনা এই তিন বিভাগে ভারতীয় সেনা বিভক্ত হয়। বাঙ্গালা, আসাম, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা, মধ্য-ভারতের কিয়দংশ এবং পঞ্জাব এই কয়টি প্রদেশ বঙ্গীয় সেনা-বিভাগ দ্বারা রক্ষিত হইত। সম্প্রতি বঙ্গীয় সেনা হইতে পঞ্জাব সেনা পৃথক্‌ভূত হইয়া স্বতন্ত্র সেনাপতির শাসনাধীন হইয়াছে, সুতরাং সমুদয় ভারতবর্ষে এখন চারিটি সেনা-বিভাগ হইয়াছে। মাদ্রাজী সেনাবিভাগীয় সৈনিকেরা নিজ মাদ্রাজ প্রদেশে, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, ব্রহ্মদেশ এবং আন্দামান দ্বীপ-

পুঞ্জে অবস্থান করিতেছে। বোম্বাই বিভাগীয় সৈনিকেরা বোম্বাই প্রদেশ, সিন্ধু, মধ্য-ভারতের দেশীয় রাজগণের অধিকৃত প্রদেশ এবং লোহিতসাগরোপকূলবর্ত্তী এডেন নগর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। বঙ্গীয় ও পঞ্জাব বিভাগে কামান আছে, অশ্বারোহী সৈনিকও অনেক আছে; মাদ্রাজী বিভাগে অশ্বারোহীর সংখ্যা কম, কামান আদতেই নাই। সমগ্র ভারতসেনার জন্য কত টাকা ব্যয় পড়ে শুনিলে পাঠক বিস্মিত হইবেন। ভারত গভর্মেণ্টের বার্ষিক আয়ের এক তৃতীয়াংশের কিঞ্চিৎ কম এই বিপুল সেনা-রক্ষণে বৎসর বৎসর ব্যয় হইতেছে। এক ব্যক্তির যদি মাসিক আয় ১০০৲ টাকা হয়, আর দ্বারবানদিগের বেতনে যদি তাহার ৩০।৩২ টাকা খরচ পড়ে তাহা হইলে তাহার সহিত ভারত গভর্মেণ্টের অবস্থার তুলনা হইতে পারে। এক এক জন দেশীয় সৈনিকের প্রতি গড়ে মাসে ৮।৯ টাকা পড়ে, এক্ এক জন গোরা সৈনিকের প্রতি মাসে প্রায় ৩০৲ টাকা করিয়া পড়ে। "অফিসার" অর্থাৎ সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের বেতন অবশ্য ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। গভর্মেণ্টের যে ৩০।৩২ কোটি টাকা সৈনিক ব্যয় পড়ে তাহার সমস্তই যে ভারতবর্ষে খরচ হয় এমন নহে, ইহার মধ্যে ৬।৭ কোটি টাকা বিলাতে খরচ হইয়া থাকে। সেখানে সমর-শিক্ষার বিদ্যালয় আছে, শিক্ষার্থীদিগের বিদ্যালয়ে অবস্থান, উপদেশ ও অভ্যাসে বিস্তর টাকা পড়ে।

অত্রত্য এক এক সেনা-বিভাগ এক এক জন লেপ্টেন্যাণ্ট জেনারেলের শাসনাধীন, সকলের শীর্ষস্থানে "কম্যাণ্ডার ইন্ চীফ" আছেন। লেপ্টেন্যাণ্ট জেনারেল মাসিক চারি হাজার পাঁচ শত টাকা বেতন পান, কম্যাণ্ডার ইন্ চীফের বেতন বার্ষিক ৮০ হাজারের কম নহে। কম্যাণ্ডার ইন্ চীফের পদ সর্ব্বপ্রধান, "এন্সাইন"এর পদ সর্ব্ব-নিম্ন, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী "কাপ্তেন" "লেপ্টেন্যাণ্ট," "কর্ণেল" প্রভৃতি অনেক গুলি সেনানী-পদ আছে। এই সকল পদাধিষ্ঠিত কর্ম্মচারীদিগের

অধীনে থাকিয়া গোরা ও সিপাহীরা যুদ্ধ করিয়া থাকে। সেনা-বিভাগের অন্তর্গত একটি বিভাগ আছে তাহার নাম "কমিশেরিয়েট" বা রশদ বিভাগ। এই বিভাগের কর্ত্তার নাম "কমিশেরি জেনারেল," ইনি একজন উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী। মনে কর আফগানস্থানের কোন অসভ্য জাতিকে শাসন করিবার জন্য ১০ রেজিমেণ্ট গোরা ও ১৫ রেজিমেণ্ট সিপাহী পঞ্জাব হইতে প্রেরিত হইল। ইহারা প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে কমিশেরিয়েট বিভাগের গোমস্তারা তাম্বু, আটা, ঘৃত, রম, আহতদিগের জন্য ডুলি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী গন্তব্য প্রদেশে পাঠাইয়া দিবেন। এই সকল জিনিশ লইয়া যাইবার নিমিত্ত এবং কামান টানিবার জন্য বলদ, উট, হাতী ও অন্যান্য ভারবাহী পশু এবং কুলি মজুরের আবশ্যক, তাহাও কমিশেরিয়েটী লোকেরা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ইংরাজের এমনই সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলা, সৈনিকদলগুলি আফগানস্থানের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেই নিমেষ-মধ্যে অমনি শিবিরস্থাপন হইবে, আধ ঘণ্টা পরে যাইয়া দেখিবে সেনানীগণ নিজ নিজ শিবিরে বসিয়া লেখা পড়ার কাজ করিতেছেন, একটী শিবিরে ডাকঘর বসিয়াছে, অপর শিবিরে হাসপাতাল খোলা হইয়াছে, সৈনিক চিকিৎসক পীড়িতদিগের চিকিৎসা করিতেছেন, শিবিরান্তরে কমিশেরিয়েট বিভাগের কর্ত্তারা, বড় বাবু, কেরাণী, গোমস্তা সকলেই হিসাবপত্র করিতেছেন। ফলতঃ তোমার বোধ হইবে যেন তুমি একটী ঐন্দ্রজালিক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রস্থান করিবার সময়ও যেন মন্ত্রবলে নিমেষমধ্যে এই নগর ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইবে, তাহার চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। ইংরাজের এই সুশৃঙ্খলা আছে বলিয়াই আজ তিনি ইন্দ্রত্ব পদ পাইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রভুত্ব করিয়া বেড়াইতেছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রেলওয়ে।

উপকার।

পাঠক শুনিয়া থাকিবেন রুশ গভর্মেণ্ট মধ্য-এশিয়ার যে যে স্থানে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন সেই সেই স্থানে রেল বসাইয়া যাইতেছেন। ইহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথম, অগ্র-গমন-পথে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে রুশরাজ্য হইতে রেলযোগে সহজে সৈন্য প্রেরিত হইতে পারিবে; দ্বিতীয়, মধ্য-এশিয়ার সহিত রুশের বাণিজ্য চলিবার পক্ষে সুবিধা হইবে, মধ্য-এশিয়ার বণিকেরা রেলযোগে রুশে মাল পাঠাইতে পারিবেন, রুশ বণিকেরাও ঐরূপে মধ্য-এশিয়ায় বাণিজ্য দ্রব্য পাঠাইতে পারিবেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতবর্ষে ক্রমশঃ অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন তখন এই দুইটী সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখেন নাই। তাঁহারা যদি রুশ গভর্মেণ্টের প্রণালী অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে ১৮৫৭ সালের সৈনিকবিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে এত কষ্ট পাইতে হইত না। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় হাবড়া হইতে কেবল রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল খোলা হইয়াছিল, তাহাতেও বিদ্রোহ-দমনের সবিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, রেলওয়ে হইতে শত্রুশাসনের যেমন সুবিধা হয় বাণিজ্য-বৃদ্ধি-নিবন্ধন প্রজাপালনেরও সেইরূপ সুবিধা হইয়া থাকে।

প্রজাপালনের আর একটী সুবিধার কথা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। আজ কাল এদেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতেছে। দুর্ভিক্ষের সময় গভর্মেণ্ট অকাতরে কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া নিরন্ন প্রজার প্রাণরক্ষা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে অধিক রেলওয়ে ছিল না, অথচ এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অধিক লক্ষিত হইত, সুতরাং গভর্মেণ্ট প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াও প্রজার প্রাণরক্ষা করিতে পারিতেন

না। এখন সে অসুবিধা নাই; এখন চারিদিকে রেলওয়ে হইয়াছে, চারিদিক হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে চাউল পাঠান যাইতে পারে, রাজপুরুষেরাও রেলযোগে যাইয়া নিরন্নদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাহাদের কষ্ট দূর করিতে পারেন। এই সুবিধার সহিত তুলনায় যাত্রীদিগের যাতায়াতের সুবিধা সামান্য বলিয়া গণনীয়।

জগতে অবিমিশ্র সুখ হইতে পারে না, অনিষ্টের আশঙ্কা নাই এমন ইষ্ট প্রায়ই আমাদের ভাগ্যে ঘটে না। প্রজাহিতৈষী গভর্মেণ্ট আমাদের মঙ্গলের জন্য রেলওয়ে স্থাপিত করিলেন, মঙ্গলও নানা প্রকারে হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বর্ষাবারি-বহির্গমনের পথ স্থানে স্থানে রুদ্ধ হইয়া ম্যালেরিয়া জ্বরের আবির্ভাব হইল। বর্ষার জল গ্রামসমূহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধান্যক্ষেত্রে পতিত হয়, এখানে প্রয়োজনানুরূপ জল সঞ্চিত থাকে, অতিরিক্ত জল বিল, খাল ও নদীতে বহিয়া যায়, সুতরাং গ্রামের ভূমি অতিশয় জলসিক্ত হয় না। এদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা এইরূপ প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তাহার পর যখন ইংরাজেরা রেলওয়ে খুলিলেন, উভয় পার্শ্ব হইতে মাটি কাটিয়া বাঁধ বাঁধিয়া তাহার উপর দিয়া রেল পাতিলেন, তখন জলনির্গমের ব্যাঘাত ঘটিল, বাঁধের স্থানে স্থানে জলনিকাশের পথ রাখা হইলেও ধান্যক্ষেত্রস্থ সমুদয় জল ভাল করিয়া বাহির হইল না, বর্ষায় গ্রামে জল বসিতে লাগিল, বর্ষান্তে ম্যালেরিয়া নামক বিষাক্ত বাষ্প উদ্গত হইয়া গ্রামবাসীদিগের দেহে প্রবিষ্ট হইল, জ্বরে কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল, শরীর জীর্ণ হইতে লাগিল, লক্ষ লক্ষ লোক ইহলোক হইতে অপসারিত হইল। এই ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশের যে কত অনিষ্ট ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

আর একটী অনিষ্টের কথা লোকে কহিয়া থাকে, কিন্তু তাহা ইষ্ট কি অনিষ্ট তাহা বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। রেলওয়ে হইলে গ্রাম-জাত ফল, মূল, মৎস্য, দুগ্ধ প্রভৃতি তাবৎ সামগ্রী নগরাভিমুখে চলিয়া

যায়, সুতরাং গ্রামে সেই সকল সামগ্রী দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে যেখানে পয়সায় ৮ টা বেগুন পাওয়া যাইত এখন রেল হওয়াতে সেখানে পয়সায় ২।৩ টা বই পাওয়া যায় না। গ্রামবাসী ভদ্রলোক-দিগের, বিশেষতঃ আলস্যপরায়ণ নিষ্কর্ম্মা ব্রহ্মত্র-ভোগীদিগের, ইহাতে অসুবিধা ও কষ্ট হইতে পারে কিন্তু গ্রাম্য শ্রমজীবীদিগের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। পূর্ব্বে তাহাদের উৎপন্ন সামগ্রীর ক্রেতা জুটিত না, কাজেই তাহা সস্তা দরে বেচিতে হইত, এখন বেশি দরে বেচিয়া তাহারা বিলক্ষণ লাভ করিতেছে। স্বভাব জাত কত জিনিশ পূর্ব্বে সংসারের কোন কাজে আসিত না, এমনি নষ্ট হইয়া যাইত, এখন রেলওয়ের কল্যাণে তাহা লোকের কাজে লাগিতেছে, অনেকে তাহা হইতে দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া নিজ অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন। পদ্মার নিকট ইলিশ মাছ সেকালে পয়সায় ৩।৪টা পাওয়া যাইত, এখন পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ে হওয়াতে মৎস্য ব্যবসায়ের সুবিধা হইয়াছে, এক একটা মাছ ১০ আনা ৵১০ পয়সায় বিক্রি হইতেছে, গাড়ি গাড়ি মাছ কলিকাতায় আমদানি হইতেছে। এই মৎস্য ব্যবসায়ে অনেকের জীবিকাসংস্থান হইতেছে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১৮৫৩ সালে লর্ড ড্যালহৌসী ভারতবর্ষে রেলওয়ে সংস্থাপনের কল্পনা করিয়া কোন্ কোন্ পথ দিয়া রেল বসান হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া একটা মন্তব্য প্রকাশ করেন। ঐ বৎসর বোম্বাই হইতে কয়েক মাইল রেল প্রস্তুত হয়, ইহাই অধুনাতন গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলা রেলওয়ের সূত্রপাত। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি হাবড়া হইতে রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, ১৮৫৫-৫৬ সালে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গাড়ি চলিতে লাগিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি কলিকাতার পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত শিয়ালদহ হইতে রেলওয়ে খুলিলেন। ক্রমশঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

দিল্লী পর্য্যন্ত চলিল. ইহার একটী শাখা এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর পর্য্যন্ত খোলা হইল। ও দিকে বোম্বাই হইতে জব্বলপুর পর্য্যন্ত একটী লাইন এবং মাদ্রাজের উপান্ত প্রদেশ রাইচুর পর্য্যন্ত আর একটী লাইন খোলা হইল। সুতরাং হাবড়ায় গাড়ি চড়িলে জব্বলপুর হইয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত যাইবার সুবিধা হইল। মাদ্রাজ হইতে রাইচুর পর্য্যন্ত যে লাইন আসিয়াছে তাহাতে মাদ্রাজ ও বোম্বাই রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত হইল। লর্ড ড্যালহুসী ১৮৫৩ সালে কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটী রাজধানী নগরকে রেলওয়ে দ্বারা সংযুক্ত করিবার যে কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা ১৮৭০ সালে লর্ড মেওর শাসনকালে সিদ্ধ হইল। ইদানীং বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানির কল্যাণে রেল-পথ-নির্ম্মাণে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ইঁহারা আর কয়েক মাস মধ্যে লৌহবর্ত্ম সূত্রে কলিকাতা, মাদ্রাজ বোম্বাই এবং এতন্মধ্যবর্ত্তী প্রদেশসমূহকে গ্রথিত করিয়া ফেলিবেন।

আজকাল ভারতবর্ষের চারিদিক দিয়া যেরূপ রেল গিয়াছে একশত টাকা হাতে করিয়া একমাসের মধ্যে সমুদয় দেশ পরিদর্শন করা যায়। কলিকাতার সিয়ালদহ ষ্টেশনে উঠিয়া গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত যাইতে পার। পথে রাণাঘাটে নামিয়া ষ্টীম ট্রামে উঠিয়া গৌরাঙ্গদেবের প্রথম লীলা-ভূমি শান্তিপুর ও নবদ্বীপ এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী কৃষ্ণনগর দেখিতে পার। গোয়ালন্দে নামিয়াই ষ্টীমার পাইবে. সেই ষ্টীমারে চাঁদপুর যাইতে পার, সেইখান হইতে চট্টগ্রামে যে রেল গিয়াছে তাহাতে উঠিয়া চট্টগ্রামে যাইয়া তত্রত্য চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পার। পথে কুমিল্লা, ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রদেশও দেখা হইবে। গোয়ালন্দ হইতে আর একখানি ষ্টীমার নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত যায়। এই নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলওয়ে দিয়া বঙ্গের পূর্ব্ব রাজধানী ঢাকা বিক্রমপুর বেড়াইয়া আসিতে পার। আবার ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের দামুকদিয়া ঘাট

ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া ষ্টীমারে সাড়াঘাট যাইতে পারিবে, এখান হইতে রেলযোগে কুচবিহার, দার্জ্জিলিঙ্গ, জলপাইগুড়ি, কারসিয়ং, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কামরূপ, কামাখ্যা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের নানা দ্রষ্টব্য দেখিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পার। এদিকে দমদমা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ে গিয়াছে। ইচ্ছা হয়, পথে যশোহর নগর দেখিতে পার, না হয় খুলনা হইতে ষ্টীমার লইয়া বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে যাইতে পার। এইরূপে ইংরাজের রেলওয়ে ও ষ্টীমারের কল্যাণে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের যাহা কিছু দ্রষ্টব্য আছে সকলই দেখিয়া আসিতে পার। আবার যদি সুন্দরবনের প্রকৃতি-সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও, অথবা বন্দুক লইয়া হরিণী কিংবা ব্যাঘ্ররাজের অনুসরণ করিতে চাও তাহা হইলে শিয়ালদহ হইতে দক্ষিণাভিমুখে রেলে যাইয়া মাতলার ষ্টেশনে নামিয়া নৌকা-যোগে অথবা পদব্রজে গমন করিয়া আক্ষেপ মিটাইয়া লইতে পার। বহিঃশত্রুর রণতরী আসিয়া কলিকাতা আক্রমণ করিতে যাহাতে না পারে গভর্মেণ্ট তাহার কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন শিয়ালদহ হইতে আর একটী শাখা লাইন ধরিয়া ডায়মণ্ড হারবারে নামিয়া তাহা দেখিয়া আসিতে পার।

ওদিকে হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ভারতবর্ষের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পার। শেওড়াফুলি হইতে শাখা লাইনে যাইয়া তারকেশ্বরে তারকনাথ দর্শন করিতে পার, চন্দননগরে নামিয়া ফরাশীনগরের শাসন-প্রণালী অবলোকন করিতে পারিবে, হুগলীতে নামিয়া হুগলী-ঘাট ষ্টেশন হইয়া সেতুর উপরিস্থিত লাইন ধরিয়া ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলের নৈহাটী ষ্টেশনে উঠিতে পারিবে। অথবা ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান লাইনে বরাবর চলিয়া পথে বর্দ্ধমানের রাজবাটী, রাণীগঞ্জে বরণ কোম্পানির মৃৎপাত্র-নির্ম্মাণের কারখানা দেখিয়া এসানসোলে নামিয়া বেঙ্গল-নাগপুর লাইন ধরিয়া মধ্য-ভারতের মধ্য দিয়া বোম্বাই

পর্য্যন্ত যাইতে পার। না হয় সোজা চলিয়া মধুপুর হইতে গিরিডি শাখায় পরেশনাথ দর্শন এবং বৈদ্যনাথ জংশন হইতে ষ্টীম ট্রামে বৈদ্যনাথ দর্শন করিয়া পুনরায় প্রধান লাইনে আসিয়া বাঁকিপুর হইতে গয়া, গয়া হইতে কাশী এই দুইটী তীর্থদর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ কর। কাশী হইতে আউড্ রোহিলখণ্ড রেলওয়ের বহুশাখা ধরিয়া লক্ষ্ণৌ, শাহরণপুর ও হরিদ্বার পর্য্যন্ত যাইতে পার। পুনরায় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের আশ্রয় লইয়া প্রয়াগতীর্থে উপনীত হইবে, উপনীত হইবার পূর্ব্বে নইনি ষ্টেশনে নামিয়া দক্ষিণাভিমুখে বরাবর যাইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম রাজধানী বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইবে, পথে পুণ্যতোয়া শ্বেতশৈলশয্যা নর্ম্মদার বজ্রনির্ঘোষ জলপ্রপাত দর্শন করিলে বিস্ময়ে হৃদয় আপ্লুত হইবে।

এলাহাবাদ হইতে উত্তরপশ্চিমে গমন করিয়া ইতিহাস-প্রথিত কাণপুর ও দিল্লী নগরী দেখিতে পাইবে পথে তণ্ডুলা ষ্টেশনে নামিয়া আগ্রায় যাইতে পারিবে। আগ্রা হইতে রাজপুতনা মালব রেলওয়ে দিয়া ভরতপুর, জয়পুর প্রভৃতি নগর এবং পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থস্থান দেখিতে পাওয়া যায়; ইণ্ডিয়ান মিড্ল্যাণ্ড রেলওয়ে দিয়া গোয়া-লিয়রে ও ভূপালে যাওয়া যায়, ভূপাল হইতে শাখা লাইনে যাইয়া রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরীতে উপস্থিত হইতে পারিবে। পুনরায় তণ্ডুলায় আসিয়া কিয়দ্দূর যাইয়া হাত্রাস ষ্টেশনে পৌঁছিবে, এখান হইতে স্বতন্ত্র লাইনে মথুরা বৃন্দাবন দর্শন হইবে। দিল্লী হইতে দিল্লী-অম্বালা-কল্কা রেলওয়ে দিয়া পানিপথ, কুরুক্ষেত্র, অম্বালা ও কল্কা পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। কল্কা হইতে সিমলা পাহাড়ে এবং অম্বালা হইতে নর্থওয়েষ্ট রেলওয়ে দিয়া বীরপ্রসূ পঞ্জাব প্রদেশ পরিদর্শন করা যায়, এবং শাখা ও উপশাখা লাইন দিয়া পেশবার পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। ফলতঃ গভর্মেণ্টের উদ্যোগে ও উৎসাহে ছোট বড় মাপের রেলওয়ের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে বড় লাট বাহাদুর

কলিকাতা হইতে সিমলায় যাইবার সময় এবং সিমলা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার সময় পথিমধ্যে রেলগাড়িতে রাজহালে বসিয়া শুইয়া বঙ্গ বিহার, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, পেশবার, কোয়েটা, রাজপুতনা, মধ্যভারত, দক্ষিণাপথ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, আসাম, ব্রহ্ম সমুদয় স্থান পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

কার্য্য-প্রণালী।

লর্ড ড্যালহুসী ১৮৫৬ সালে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন, আর আজ ১৯০০ সাল। এই ৪৪।৪৫ বৎসরে রেলওয়ে লাইনে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের উৎসাহ ব্যতিরেকে এত অল্প সময়ে চারিদিকে এত রেলওয়ে কিছুতেই হইত না। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন-সুলা রেলওয়ে, ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে প্রভৃতি কয়েকটী লাইন খুলিবার সময় গভর্মেণ্ট অংশীদারদিগকে শতকরা পাঁচ টাকা সুদ পোষাইয়া দিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এস্থলে এই কথা বুঝিয়া রাখা আবশ্যক যে, সাহেবদের যে সকল বড় বড় কারবার দেখিতেছ তাহা একজনের টাকায় চলিতেছে না। জনকতক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভদ্রলোক মিলিত হইয়া একটী কার্য্য-সম্পাদক সভা গঠিত করেন, এবং এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, আমরা অমুক কারবার খুলিতেছি, ইহাতে বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা, ৫০ লক্ষ টাকা মূলধনের প্রয়োজন, ৫০,০০০ "শেয়ার" (অংশ) খুলিয়া এই টাকা তোলা হইবে, এক একটী শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া লোকে শেয়ার কিনিতে আরম্ভ করে, যাহার যেমন টাকা তিনি তদনুসারে ২টী, ৫টী, ১০০টী বা ততোধিক শেয়ার লয়েন। প্রথম অবস্থায় সমুদয় মূলধনের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং অংশীদারদিগের নিকট হইতে প্রথমে শেয়ারের পূরা টাকা আদায় করা হয় না, প্রয়োজন অনুসারে ক্রমশঃ টাকা লওয়া হয়। এইরূপে সমুদয় মূলধন উঠিয়া যায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও অন্যান্য কতিপয় রেলওয়ে এইরূপে শেয়ার খুলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছিল। লোকসানের ভয়ে লোকে শেয়ার লইতে না চাহিতে পারে, এইজন্য ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট শতকরা ৫ টাকা সুদের কথা বলিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলিয়া রাখিলেন, ইচ্ছা করিলে আমরা ২৫ কি ৩০ বৎসর পরে বাজার দরে রেলওয়ে কিনিয়া লইব। এই সর্ত্ত অনুসারে ১৮৮০ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, ১৮৮৩ সালে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে এবং ১৮৮৬ সালে সিন্ধু পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ে ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের খাসে আসিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের বার্ষিক লাভ প্রায় ৪॥ কোটি টাকা। গভর্মেণ্ট এই রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ১০ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করিলেন, আপনারা যেমন কাজকর্ম্ম করিতেছেন সেইরূপই করুন, লভ্যাংশের তিন আনা আপনারা লইবেন, গভর্মেণ্ট তের আনা লইবেন। ১৮৯৯ সালে এই মিয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে, ১৯০০ সাল হইতে পুনরায় নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে। যে সকল অংশীদার আপনাদের টাকা তুলিয়া লইতে চাহিয়াছেন গভর্মেণ্ট ১০০ টাকা শেয়ারের মূল্য ১২৫৲ টাকা হিসাবে ধরিয়া তাঁহাদের টাকা চুকাইয়া দিয়াছেন। এই হিসাবে যাঁহার এক লক্ষ টাকার শেয়ার ছিল তিনি এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা পাইয়াছেন। এখানে বলিয়া রাখি, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের অংশীদারেরা সকলেই ইংল্যাণ্ডের লোক, এখন একজন মাত্র এদেশীয় অংশীদার আছেন।

আর কতকগুলি রেলওয়ে আছে তাহাতে গভর্মেণ্ট অল্প হারে সুদ পোষাইয়া দিবেন অঙ্গীকার করেন, সুদ বেশি দিন দিবারও কথা থাকে না। কোন কোন স্থলে গভর্মেণ্ট অমনি জমি দিয়া থাকেন। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ে (খুলনা লাইন), দার্জ্জিলিঙ্গ হিমালয় রেলওয়ে, দেওঘর রেলওয়ে, তারকেশ্বর রেলওয়ে প্রভৃতি অনেকগুলি রেলওয়ে

এইরূপ গভর্মেণ্টের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আর দুই শ্রেণীর রেলওয়ে আছে। প্রথম, যে গুলি গভর্মেণ্ট নিজ তহবিল হইতে খরচ করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন, ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ে, ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ে, নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে প্রভৃতি বহুসংখ্যক রেলওয়ে এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয়, এদেশীয় রাজাদিগের নিজ ব্যয়ে নির্ম্মিত রেলওয়ে; রাজপুতানায় যোধপুর লাইন, হায়দ্রাবাদে নিজামের রেলওয়ে, মহীশূর রেলওয়ে, পঞ্জাবে রাজপুর পাতিয়ালা লাইন প্রভৃতি কতকগুলি লাইন এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

টেলিগ্রাফ্।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত ব্যতিরেকে রেলওয়ে চলিতে পারে না। তারে সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা না থাকিলে রাজ্যশাসনও সুচারুরূপে চলিতে পারে না। নৈহাটীতে গোহত্যা লইয়া হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা হইবার উপক্রম হইল, অমনি তারযোগে ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সংবাদ পাইলেন; ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ভয় মৈত্রী দেখাইয়া উভয়পক্ষকে শান্ত করিলেন, যাহারা আইনের অমর্য্যাদা করিয়া শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল তাহাদিগকে রাজ-দ্বারে বিচারার্থ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া নিরীহ প্রজার উদ্বেগ দূর করিলেন। আবার দেখ, ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশের বর্ব্বর জাতিরা যদি ইংরাজ প্রজার উপর উপদ্রব আরম্ভ করে বিদ্যুৎবেগে সংবাদ না আসিলে বড়লাট বাহাদুর সিমলা শিখরে অথবা কলিকাতায় বসিয়া কেমন করিয়া উপদ্রবকারীদিগের শাসন করিবেন? টেলিগ্রাফ হইতে সংবাদ-লাভ ও সৈন্যপ্রেরণের সুবিধা হয় বলিয়াই বিগত

আফগান সমরে আফগানেরা ইংরাজের টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিত, ইংরাজেরা আবার শশব্যস্ত হইয়া কাটা তারে জোড়া লাগাইয়া দিতেন।

রাজপ্রতিনিধিগণ রাজধানীতেই থাকুন আর রাজ্য-পরিদর্শনার্থ ভ্রমণ করিয়াই বেড়ান, শাসন-সংক্রান্ত এমন অনেক বিষয় আছে যাহাতে ডাক পিয়নের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা চলে না, সে সকল বিষয়ে সত্বর সংবাদ পাওয়া আবশ্যক, সুতরাং তারে খবর পাঠাইতে হয়। বোম্বাই মান্দ্রাজের গভর্ণর, বঙ্গ এবং উত্তর-পশ্চিমের লেপ্টে-ন্যাণ্ট গভর্ণর এবং গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর প্লেগ-সংবাদ প্রতিদিন না পাইলে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, বোধ হয় তারে নিত্য ইঁহাদের নিকট সংবাদ পাঠান হয়। সময়-বিশেষে ষ্টেট সেক্রেটরি মহোদয়ের নিকটও তারে সংবাদ পাঠাইতে হয়।

আজ কাল জলে স্থলে টেলিগ্রাফের তার গিয়াছে। গটাপার্চা-নামক পদার্থের আবরণ-নল প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর টেলি-গ্রাফের তার পূরিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্রোতের বেগে পাছে উহা ভাসিয়া যায় এই জন্য ঐ নলের মধ্যে মধ্যে সীস অথবা অন্য কোন পদার্থের এক একটী খণ্ড বাঁধিয়া দেওয়া হয়, উহার ভারে টেলিগ্রাফের নল নীচে নামিয়া যায়। বোম্বাই হইতে এডেনে, এডেন হইতে লোহিত সাগরের ভিতর দিয়া সুয়েজ, সুয়েজ হইতে যে পথ দিয়া ইংল্যাণ্ডে যাইতে হয় সেই পথ দিয়া টেলিগ্রাফের তার বরাবর চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে এদেশ শাসনের এত সুবিধা হইয়াছে যে কলিকাতা হইতে কালীঘাটে লোক পাঠাইয়া কোন সংবাদ আনিতে গেলে যে সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে আমাদের বিলাতী কর্ত্তা ভারতীয় কর্ত্তার নিকট হইতে কোন বিষয়ের সংবাদ পাইতে পারেন। এই সাগরোদরস্থ টেলিগ্রাফের কল্যাণে বিলাত ভারত এখন এধর ওধর হইয়াছে। সিমলা অথবা কলিকাতায় বসিয়া ভারতশাসন করা

আর বিলাতে বসিয়া ভারতশাসন করায় এখন আর বড় প্রভেদ নাই। তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণের এই সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্ট রয়টার কোম্পানিকে বার্ষিক ৪০০০০ টাকা দিয়া থাকেন। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা সর্ব্বত্রই রয়টারের লোকজন আছেন, তাঁহারা দৈনিক সংবাদ-পত্রে ও রাজপুরুষদিগের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন।

টেলিগ্রাফের তারে কেবল ক্ষুদ্রকলেবর সংবাদই প্রেরিত হইয়া থাকে, বিলাত ও ভারতের গভর্মেণ্ট যে সকল দীর্ঘ পত্রাদি লিখেন তাহা মেল ষ্টীমারে পাঠান হয়। অপর সাধারণ লোকেও মেলে পত্রাদি পাঠাইয়া থাকেন, ঐ সকল পত্রাদি প্রথমতঃ কলিকাতা হইতে মেল ট্রেনে বোম্বাই যায়, তাহার পর মেল ষ্টীমারে বিলাত চলিয়া যায়। যাইতেও ১৪।১৫ দিন, আসিতেও ১৪।১৫ দিন লাগে, ঝড় তুফানের দিনে ২।১ দিন বেশি লাগে।

টেলিগ্রাফের সৃষ্টি হওয়াতে প্রজারও বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। ব্যবসায়ীরা সর্ব্বদাই তাড়িতের সাহায্যে বাণিজ্যপ্রধান নগর হইতে মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি বিষয়ে সংবাদ লইতেছেন। ব্যাঙ্কে, কোম্পানির কাগজের বাজারে অথবা সওদাগরের হাউসে যাইলে দেখিতে পাইবে বোম্বাই হইতে দিবসে চারি পাঁচবার সোনা, কোম্পানির কাগজ ও একস্চেঞ্জের দর আসিতেছে, দালালেরা সেই দর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কয়েক বৎসর হইতে টেলিগ্রাফে মনিঅর্ডারও চলিতেছে। তুমি লাহোরে থাক, আমি কলিকাতায় টেলিগ্রাফ আপিশে টাকা জমা দিলাম, তুমি লাহোরে বসিয়া দুই ঘণ্টা পরে সেই টাকা পাইবে। আজকাল টেলিগ্রাফ আপিশের কাজ এত চলিতেছে যে গভর্মেণ্টের টেলিগ্রাফ বিভাগ হইতে বৎসরে অন্যূন আশী লক্ষ টাকা আদায় হইয়া থাকে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা।

ইংরাজ গভর্মেণ্ট কেরাণী মুহুরি তৈয়ার করিবার জন্য এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এরূপ মনে করা ভ্রম। ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজগুলি সন্তাদরের হাকিম গড়িবার কল এরূপ মনে করাও মহাপাপ। গভর্মেণ্ট যদি সেরূপ সঙ্কীর্ণমতি হইতেন তাহা হইলে ১৭৮১ সালে মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংশ কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত করিতেন না, ১৭৯১ সালে বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইত না, ১৮২৩ সালে আগ্রা কলেজ এবং ১৮২৪ সালে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইত না। ১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যে কলিকাতা-মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা কি কেরাণী মুহুরি তৈয়ার করিবার জন্য? ফল কথা, গভর্মেণ্ট স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে এদেশীয়দিগের শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করেন নাই, এখনও করিতেছেন না; প্রজার শিক্ষার দিকে রাজার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য এই বিবেচনায় ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পিতার অন্নসংস্থান না থাকিলেও তিনি পুত্রের বিদ্যাভ্যাসের চিন্তা করিয়া থাকেন, রাজাও সেইরূপ দরিদ্র হইলেও প্রজার শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

কোম্পানির শাসন-প্রারম্ভে কর্ত্তৃপুরুষেরা এই কর্ত্তব্য হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেই রাজকীয় শিক্ষা-প্রণালীর আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়। প্রথম প্রথম খৃষ্টান পাদরীরাই ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে দেশীয় ও ইংরাজী ভাষায় লেখা পড়া শিখাইবার জন্য স্কুল কলেজ করেন। ১৮৫৪ সালে সার চারল্‌স উড বিলাত হইতে একটী

সুদীর্ঘ শিক্ষা-মন্তব্য লিখিয়া পাঠান, তাহা অবলম্বন করিয়াই বঙ্গ, বোম্বাই ও মাদ্রাজে এক একটী বিশ্ববিদ্যালয় ও এক একটী স্বতন্ত্র শিক্ষা-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয় এণ্ট্রান্স, ফার্ষ্ট আর্টস, বি এ, এম এ, বি এল, পরীক্ষা এবং ডাক্তারির এল এম এস ও ইঞ্জিনিয়ারিং এল সি ই উপাধি-লাভার্থীর জন্য পরীক্ষার সৃষ্টি করিলেন। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তার নাম হইল "ডিরেক্টর অব পবলিক ইন্‌ষ্ট্রক্‌শন", ইঁহার অধীনে কতকগুলি ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইলেন। ইঁহারা ও ইঁহাদের সহকারী আসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর, ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর ও সব ইন্‌স্পেক্টরগণ স্কুল পরিদর্শন করিয়া বেড়ান। এক এক জেলায় গভর্মেণ্ট নিজ ব্যয়ে এক একটি আদর্শ এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপিত করিলেন, রাজধানীতে এক একটী আদর্শ কলেজও খুলিলেন, মফস্বলে স্থানে স্থানেও কলেজ খুলিলেন, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিলেন, এবং প্রজাদিগের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে অর্থ-সাহায্য দানের বন্দোবস্ত করিলেন। গভর্মেণ্টের হস্তাবলম্ব প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষিত এদেশীয়গণ নানা স্থানে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর স্কুল স্থাপিত করিলেন, কোথাও বা গভর্মেণ্টের "এড" অর্থাৎ অর্থ-সাহায্য না লইয়াই লোকে স্কুল চালাইতে লাগিলেন। এইরূপে এখন স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল বঙ্গদেশেই দেখ ১৮৯৬।৯৭ সালে গভর্মেণ্টের ব্যয়ে ৫৫টা, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যয়ে ২২টী, গভর্মেণ্টের অর্থ-সাহায্যে ৮৫৩টী এবং গভর্মেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে ৪০৫টী, সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৩৫টী এণ্ট্রান্স ও মধ্য-ইংরাজী অথবা মাইনর স্কুল চলিয়াছিল।

অতঃপর এদেশীয়গণ আপনাদের শিক্ষার ভার আপনারাই গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া গভর্মেণ্ট আপনার স্কন্ধ হইতে কতকটা ভার নামাইবার সংকল্প করিলেন। গভর্মেণ্ট এখন এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলেন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল সমিতিকে প্রতিবৎসর কিছু

কিছু টাকা পাঠশালার সাহায্যার্থ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে। এই সকল আত্মশাসন-সমিতির হস্তে কোন কোন জেলা-স্কুলের ভারও দেওয়া হইল। হাবড়া ও মুঙ্গের জেলা-স্কুল দুইটী এখন আর গভর্মেণ্টের হস্তে নাই। বহরমপুর কলেজের সহিত এখন গভর্মেণ্ট সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন, স্বর্গীয় মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রদত্ত টাকাতেই এই কলেজ এখন চলিতেছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিপণের শাসনকালে যে শিক্ষাসংক্রান্ত কমিশন বসিয়াছিল তাঁহাদেরই পরামর্শানুসারে গভর্মেণ্ট উচ্চশিক্ষা হইতে ক্রমশঃ হস্ত সংকোচিত করিয়া আনিতেছেন এবং সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য উদ্বৃত্ত টাকা পাঠশালায় ব্যয় করিতেছেন। সেকালের গুরু-মহাশয়দিগের পাঠশালা পূর্ব্বে গভর্মেণ্ট হইতে কোন প্রকার অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত হইত না বলিয়া ইহাদের সংখ্যা অধিক ছিল না, এখন বঙ্গ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই সর্ব্বত্রই গভর্মেণ্টের নিকট চিরকালের অশ্রদ্ধিত সেই পাঠশালায় সমধিক আদর হইয়াছে, পাঠশালার ছাত্রেরাও আজ কাল গভর্মেণ্টের বৃত্তি পাইতেছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও বোম্বাইয়ে ভূমি-রাজস্বের সঙ্গে রোড সেসের ন্যায় এক প্রকার শিক্ষা-কর আদায় হইয়া থাকে, তাহা হইতেই পাঠশালার অর্থসাহায্য করা হয়। তথাপি প্রদেশীয় গভর্মেণ্ট-সমূহ নিজ তহবিল হইতে ৮৫।৮৬ লক্ষ টাকা প্রজার শিক্ষা বিষয়ে ব্যয় করিয়া থাকেন; একা বঙ্গীয় গভর্মেণ্টই ২৬।২৭ লক্ষ টাকা খরচ করেন।

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এদেশে যেরূপ শিক্ষাবিষয়িণী উন্নতি হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। এখন সামান্য কৃষক-পুত্র হইতে রাজাবাহাদুরের বংশধর পর্য্যন্ত সকলেই কিছু না কিছু লেখা পড়া শিখিতেছেন। নিম্নশ্রেণীর বালকেরা পাঠশালায় দেশীয় ভাষায় লিখিত সহজ সহজ পুস্তক পড়িতেছে, লিখিতে শিখিতেছে এবং অঙ্ক কশিতেছে, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে একটু আধটু উপদেশও পাই-

তেছে; ভদ্র সন্তানেরা ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ অধ্যাপিত ছাত্রবৃন্দের পরীক্ষার ফলানুসারে বৃত্তি পাইতেছেন, ছাত্রেরাও বৃত্তি পাইতেছে। আইন পড়িয়া যুবকেরা পরীক্ষা দিতেছেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি অথবা হাকিমি করিতেছেন। হাতুড়িয়ার হাতে লোকের অপমৃত্যু কম ঘটিতেছে, কারণ গভর্মেণ্টের প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজের শিক্ষিত চিকিৎসক চারিদিকে চিকিৎসা করিতেছেন; কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি স্থানের মেডিকেল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অপেক্ষাকৃত অল্পাধিকারী অনেক ডাক্তারও রোগীকে রোগমুক্ত করিতেছেন। হোমিওপ্যাথি-নামক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের এবং আমাদের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের সমধিক আদর ও অনুশীলন হইতেছে। কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে গভর্মেণ্ট যে "আর্টস্কুল" স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অনেক যুবক চিত্রবিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। শিবপুর, রুড়কি প্রভৃতি স্থানের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গৃহাদি নির্ম্মাণ ও যন্ত্র-রচনা বিষয়ে শাস্ত্রীয় উপদেশ ও হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শিবপুর কলেজে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থাও গভর্মেণ্ট করিতেছেন, তাহা দ্বারাও দেশের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইবে। কলিকাতার অনতিদূরে বেলগেছিয়ায় গভর্মেণ্ট পশুচিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই কলেজ হইতে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইতেছেন তাঁহারা গভর্মেণ্টের সরকারে চাকরি পাইতেছেন, ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে তাঁহারা গো-চিকিৎসার উন্নতি করিয়া গো-সর্ব্বস্ব কৃষকের যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন। গভর্মেণ্টের উৎসাহে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে এবং এদেশীয়দিগের চেষ্টায় স্থানে স্থানে শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে। ব্যায়াম-শিক্ষার দিকেও গভর্মেণ্টের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে।

সকল জেলা স্কুলেই ইহার যথাসম্ভব আয়োজন করা হইয়াছে। স্ত্রী-জাতির শিক্ষাবিষয়েও ভূয়সী উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। এক বঙ্গ-দেশেই তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার বালিকা বিদ্যালয় চলিতেছে, তাহাতে ৬০।৬৫ হাজার বালিকা লেখা পড়া শিখিতেছে। এই সকল বিদ্যালয়ের সাহায্যদানে বঙ্গীয় গভর্মেণ্টের কিছু কম এক লক্ষ টাকা খরচ হইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে অনেকাংশে পশ্চাৎপদ। কিন্তু সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই যে আশাতীত উন্নতিলাভ হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সংবাদ-পত্রের গ্রাহক-সংখ্যা এবং সুপাঠ্য পুস্তকের পাঠক-সংখ্যার বৃদ্ধি দেখিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

রাজা ও প্রজার কর্ত্তব্য।

প্রজার প্রতি রাজার যাহা যাহা কর্ত্তব্য ইংরাজ গভর্মেণ্ট তৎসম্পাদনে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেছেন, একথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজপুরুষেরা আমাদের স্বাস্থ্যের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। স্কুল কলেজে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পড়াইতেছেন এবং সেই বিজ্ঞান অনুসারে চলিয়া যাহাতে প্রজারা স্বাস্থ্যরক্ষণে সমর্থ হয় রাজবিধি প্রণয়ন করিয়া তৎপক্ষে সহায়তা করিতেছেন। প্লেগ, বসন্ত, বিসূচিকা প্রভৃতি হিংস্র রোগের আবির্ভাব হইলে গভর্মেণ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া রোগীর চিকিৎসা ও স্বতন্ত্র-বাসের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু ঈদৃশ দুর্দ্দৈব ঘটিলে প্রজার কর্ত্তব্য প্রজা না করিলে রোগের হাত এড়াইতে পারিবেন না। বাস-ভবন

ও চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান পরিস্কৃত রাখা উচিত, পরিচ্ছদ শয্যাদি নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সহিত বাটীর অন্যান্য ব্যক্তির যথাসম্ভব সংস্রব পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত, রোগাক্রান্ত স্থান কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়, প্রতিবেশীরা যাহাতে সংস্পর্শদোষে রোগাক্রান্ত না হয় তৎপক্ষে সাবধান হওয়া বিধেয়। চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের দারুণ উত্তাপে মফস্বলে যৎপরোনাস্তি জলকষ্ট হয়, পঙ্কাবিল জলপানে উদর-রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। সম্পন্ন প্রজারা যদি চাঁদা করিয়া টাকা তুলেন তাহা হইলে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অর্থসাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া গভর্মেণ্টও নিজ তহবিল হইতে প্রয়োজনানুরূপ অর্থসাহায্য করিতে পারেন।

নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখা প্রজার প্রধান কর্ত্তব্য। প্রজারা নিজে চেষ্টা করিয়া আপনাদের শরীর সবল ও সুদৃঢ় করিলে আপনাদেরই মঙ্গল। এ বিষয়ে গভর্মেণ্টের মুখাপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। আজ কাল চারিদিকেই ডাকাইতির কথা শুনা যায়। কোন গৃহস্থের বাটীতে ডাকাইত পড়িলে গ্রামের লোক যদি মিলিত হইয়া পুলীশের সহায়তা করেন তাহা হইলেই দস্যুরা ধৃত অথবা তাড়িত হইতে পারে। সেকালে ভদ্রসন্তানেরা রীতিমত ব্যায়াম করিতেন, লাঠি তলওয়ার খেলিতে পারিতেন, পল্লীর ভিতর ডাকাইতি হইলে গৃহস্থকে অভয়দান করিতেন। আজ কাল পল্লীগ্রামে ব্যায়াম চর্চ্চা নাই, লাঠি তলওয়ার খুঁজিয়া পাওয়াই যায় না। ভদ্রসন্তানেরা বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাচিন্তায় আকুল, অব্যায়ামশীল, অম্ল-অজীর্ণ-রোগে শীর্ণ-দেহ এবং অকাল বার্দ্ধক্যে অভিভূত হইয়া জীবনের সকল সুখে বঞ্চিত। প্রজার শরীর প্রজাই রক্ষা করিবে, গভর্মেণ্ট তাহার শরীর রক্ষা করিতে পারেন না। তথাপি গভর্মেণ্ট বিদ্যালয়ে ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কলিকাতায় ৫০০০০ টাকা খরচ করিয়া যুবকদিগের ব্যায়ামের জন্য ক্রীড়াভূমি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে গভর্মেণ্ট বিস্তর করিয়াছেন ও করিতেছেন; প্রজারাও এ বিষয়ে অগ্রসর হইতেছেন, আপনারা চেষ্টা করিয়া আপনাদের শিক্ষাবিষয়ক অভাব দূর করিতেছেন, ইহা আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল সাহিত্য অনুশীলনে জীবিকাসংস্থান হইবে না, ব্যবসায়-শিক্ষার দিকে এবং শিল্প ও কৃষি শিক্ষার দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। রাজপুরুষেরা এদিকে ঝুঁকিয়াছেন, প্রজারা তাঁহাদের সহায়তা করিলে কৃষিশিল্পদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া অনেকে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

গভর্মেণ্ট রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আইন করিয়াছেন, আইনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পুলীশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজবিধি ও রাজপ্রতিনিধির অবমাননা করা প্রজার কর্ত্তব্য নয়, রাজাদেশ ও রাজপুরুষের নিকট নতশির হইয়া চলাই প্রজার প্রধান কর্ত্তব্য, একথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। শরীরের এক স্থানে ক্ষত হইলে সমুদয় দেহ অসুস্থ হয়, পুষ্করিণীর এক স্থানে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে সমুদয় জল ক্ষুব্ধ হয়। রাজ্যেরও সেই রূপ এক স্থানে শান্তিভঙ্গ হইলে সমগ্র রাজ্যের অমঙ্গল হয়। অতএব শান্তিরক্ষণে প্রজার সবিশেষ সাহায্য করা কর্ত্তব্য। যাহারা গভর্মেণ্টের কোন আদেশ অথবা প্রস্তাবের কদর্থ গ্রহণ করিয়া বিচলিত হয় তাহাদের ভ্রম দূর করা শিক্ষিত প্রজার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এদেশে যখন প্রথম "সেন্সস্" অর্থাৎ লোক-গণনা হয়, তখন মূর্খ লোকে বলিয়াছিল "কোম্পানি টেক্স বসাইবার জন্য মানুষ গণ্‌তি করিতেছে"। এই উপলক্ষে সাঁওতাল পরগণায় বিদ্রোহ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। আবার, যখন গভর্মেণ্ট প্লেগ-নিবারণী ব্যবস্থা করেন, তখন মূর্খ লোকে না বুঝিয়া কত মিথ্যা রটনাই করিয়াছিল, তাহার দরুণ কত স্থানে কত দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্যের মঙ্গলানুরোধে ঈদৃশ কুসংস্কারাবিষ্টদিগের ভ্রম দূর করা শিক্ষিত প্রজার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রজার অন্নসংস্থানের পথ পরিষ্কৃত করা রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতায় রাজার সুখস্বচ্ছন্দতা। দুর্ভিক্ষের সময় প্রজার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য গভর্মেণ্টের কোটি কোটি টাকা খরচ হইয়া যায়। যদি দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে এই কোটি কোটি টাকায় লোক-হিতকর কত অনুষ্ঠানই গভর্মেণ্ট করিতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় গভর্মেণ্টের রাজস্ব পূর্ণমাত্রায় আদায় হয় না, প্রজা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলে করদাতার সংখ্যা কমিয়া যায়, তাহাতেও গভর্মেণ্টের রাজস্ব-ক্ষতি হয়। অতএব এই ক্ষতি নিবারণার্থই হউক, আর প্রজাবৎসলতার দরুণই হউক গভর্মেণ্ট প্রজার অন্নাভাব দূর না করিয়া থাকিতে পারেন না। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, তাই গভর্মেণ্ট কৃষিতথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, কৃষি-কার্য্যের উন্নতিবিধানার্থ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভিতর কৃষিবিদ্যালয় খুলিতেছেন। এদেশের অনেক স্থানে রেশম এবং কোন কোন স্থানে পশম প্রস্তুত হয়। মুরশিদাবাদের চেলি ও গরদ, মেদিনীপুরের গরদ, ভাগলপুরের তসর, রাজসাহীর রেশম, আসামের এঁড়ি, অমৃতসরের আলওয়ান আজও প্রসিদ্ধ। বঙ্গে রেশমের কারবারের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের জন্য গভর্মেণ্ট বিশেষজ্ঞ কতিপয় লোক নিযুক্ত করিয়া তথ্যানুসন্ধান করিতেছেন। ইউরোপ প্রভৃতি বিদেশ হইতে যে কলের চিনি এদেশে আমদানি হয় তাহা তত্রত্য গভর্মেণ্টের সাহায্য পাইয়া সস্তা দরে বিক্রীত হইতেছিল, তাহাতে এদেশের চিনির ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতেছিল। এই হেতু বড় লাট লর্ড কর্জ্জন তাহার উপর আমদানি-শুল্ক বসাইয়াছেন। লর্ড কর্জ্জনের এই প্রজা-হিতকর ব্যবস্থায় দেশীয় চিনির কারবারের একটু সুবিধা হইয়াছে। গভর্মেণ্ট কৃষিশিল্পের উন্নতির জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কেবল গভর্মেণ্টের মুখপানে তাকাইয়া থাকিলে আমাদের কষ্ট ঘুচিবে না। বোম্বাইয়ে যে কাপড়ের কলগুলি আছে তাহা বিলাতের

তন্তুবায়দিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না, ইহা দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ হইলে চলিবে না। বিলাতী বণিকের সহিত যাহাতে সংঘর্ষ না হয় এমন অনেক ব্যবসায় আছে। অনেক ব্যবসায়ে ইউরোপীয় মূলধনারা আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়াছেন। ইউ-রোপীয়েরা এদেশে বঙ্গ ও মধ্যভারতে পাথরিয়া কয়লার খনি হইতে কয়লা তুলিতেছেন; হাজারিবাগ অঞ্চলে অভ্রের খনি হইতে অভ্র তুলিয়া বিলাতে রপ্তানি করিতেছেন; যশোহর, মুরশিদাবাদ, পূর্ণিয়া, ত্রিহুত প্রভৃতি জেলায় নীলের কারখানা হইতে নীল প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় নীলের হাটে পাঠাইতেছেন। ইউরোপীয়দিগের অনুকরণে এই সকল ব্যবসায়ে এদেশীয়গণ হস্তার্পণ করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন, দেখিয়া আর পাঁচ জনের সাহস ও উৎসাহ হওয়া উচিত। ১৮৩৪ সালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের যত্নে এদেশে "চা"র চাষের প্রথম সূত্রপাত হয়. আজ চা-বাগানে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে; আসাম, বঙ্গ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, মাদ্রাজ সর্ব্বত্র চা-বাগানের কাজ চলিতেছে। এদেশীয়গণ চা-বাগানের জন্য কুলি সংগ্রহ করি-তেছেন; কিন্তু চা-বাগানের কাজে বড় একটা হাত দিতেছেন না। বোধ হয় "দার্জ্জিলিঙ্গ হিন্দু টি কোম্পানি" ব্যতীত এদেশীয়দিগের পরিচালিত চা-বাগান আমাদের এ প্রদেশে নাই। নীলগিরি ও দার্জ্জিলিঙ্গে সিঙ্কোনার চাষ চলিতেছে, ইহা হইতে সুলভ কুইনাইন প্রস্তুত হইতেছে। ছোট নাগপুর প্রভৃতি পার্ব্বতীয় প্রদেশের জঙ্গলে গাছের পাতায় এক প্রকার কীট জন্মে তাহা হইতে গালা প্রস্তুত হয়, জাঙ্গলিকেরাই এই গালা সংগ্রহ করিয়া মহাজনদিগকে বিক্রয় করে। ১৮৮১ সালের হিসাবে দেখা যায় এদেশ হইতে প্রায় ৭০।৮০ লক্ষ টাকার গালা রপ্তানি হইয়াছিল। ফলতঃ সাহেবেরা যেমন যৌথ কারবার খুলিয়া অসাধ্যসাধন করিতেছেন আমরা যদি সেইরূপ "শেয়ার" খুলিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে পারি তাহা হইলে আমা-

দিগকে অন্নাভাবে ক্লেশ পাইতে হয় না। সিপাহী বিদ্রোহের পরই মহারাণী এই কথা সর্ব্বত্র ঘোষিত করেন "ভগবান যেন আমাকে এবং আমার অধীনস্থ রাজপুরুষদিগকে ভারতীয় প্রজার মঙ্গলবিধানে সমর্থ করেন। শিক্ষা, কার্য্যপটুতা ও সাধুতাগুণে যে সকল ভারতীয় প্রজা রাজকার্য পদলাভে অধিকারী তাঁহাদিগকে জাতি, শ্রেণী ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সেই সকল পদে নিযুক্ত করা আমার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত।" এই ঘোষণাপত্রই রাজকার্য পদপ্রার্থীদিগের প্রধান বল, ইহাই তাঁহাদের প্রধান দলিল। দেশকালপাত্র বিবেচনা করিলে বোধ হয় ঘোষণা-পত্রের কথা বিস্মৃত হইয়া হিতোপদেশের এই শ্লোকটীকেই আমাদের জপমন্ত্র করা কর্ত্তব্য।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।